কাঁচের মানুষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৪ সন

প্রকাশক·
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪

ব্লক
মডার্ণ প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদমুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীনেপালচন্দ্র পান
সোনালী প্রেস
২/৩, ভোলানাথ পাল লেন
কলকাতা-৬।

কাঁচের মানুষ

KANCHER MANUSH

a novel by

Shirsendu Mukherjee

১

লাভ স্টোরের বারান্দায় পা-ঠেকিয়ে সাইকেলটা দাঁড় করাল ঝিণ্টু। কাউণ্টারের ওধারে তার মেজদা বিটু একজন খদ্দেরকে হাত নেড়ে কী যেন খুব নিবিষ্টভাবে বোঝাচ্ছিল। আরো দুজন দাঁড়িয়ে শুনছিল মন দিয়ে। খদ্দেরদের একজন গোপাল মুখার্জি—রেলের টিকিট কালেক্টর, দ্বিতীয় জন বিষ্ণু সমাদ্দার—গুদামবাবু। বিটু যার সঙ্গে কথা বলছে তাকে চিনতে পারল না ঝিণ্টু।

মেজদা! এই মেজদা!

বিটু একবার তাকাল। বিরক্ত না নির্লিপ্ত তা বোঝা গেল না। তবে বিটুর মুখে একটা স্থায়ী উদাসীনতা আছে। কোন্ কথা শুনছে, কোন্ কথা শুনছে না তা ওর ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝা যাবে না কিছুতেই।

ঝিণ্টু বলল, পেইন! পেইন! বউদির!

বিটু শুনল কিনা বা বুঝল কিনা তা বোঝা গেল না। তবে নিজের বউকে দেখাশোনা করার অনেক লোক বাড়িতে আছে। তার বাবা, মা, দাদা-বউদি, ভাইপো, ভাইঝি, ভাই। বিটু খবরটা শুনল মাত্র, তারপর আবার খদ্দেরকে হাত নেড়ে বোঝাতে লাগল।

ঝিণ্টু বারান্দা থেকে পা তুলে পেডালে চাপ দিল। খবরটা তার দেওয়ার কথা ছিল, দিয়েছে। এখন সে ফ্রি। তার নিচু হ্যাণ্ডেলের রেসিং সাই-কেলটা ভালো রাস্তা পেলে দারুণ চলে। এরকম সাইকেল এ-শহরে দু-তিনটির বেশী নেই। ছ' মাস আগে বাবা তাকে এটা কিনে দিয়েছিল।

তবু আগের সাইকেলটার কথা তার খুব মনে পড়ে। না, সেটা খুব ভালো জাতের সাইকেল ছিল না। অতি সাধারণ। তার চার বন্ধু সাইকেলে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিল। উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ হয়ে তাদের ফেরার কথা ছিল। নাগপুরের কাছে দুপুরবেলা দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটা লরি তার সাইকেলটাকে পিষে দিয়ে গেল। তার বাঁ হাতটা ভাঙল, মাথায় চোট হলো দারুণ। দিন দশেক হাসপাতালে পড়ে থেকে সে অবশেষে ফিরে এলো। বাকি রাস্তাটা তাকে আসতে হলো ট্রেনে এবং একা। তার তিন বন্ধু সাইকেলে যাত্রা শুরু করে সাইকেলেই যাত্রা শেষ করে। এই সাইকেলটা সেই সাইকেলের চেয়ে অনেক বেশী দামী এবং ভালোও। কিন্তু এটা যে সেটা নয়, সেই ভাঙাচোরা সাইকেলটা মহারাষ্ট্রের কোন্ জংলা জায়গায় পড়ে পড়ে লক্কড় হয়ে যাচ্ছে সেই কথা ভেবে আজও তার মাঝে মাঝে খুঁত খুঁত করে মনটা। কান্না পায়। সেই সাইকেল তাকে অনেকটা রাস্তা পার করে দিয়েছিল তো!

ঝিন্টুর এত নরম মনের ছেলে হওয়ার কথা নয়। সে বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়, কলেজের অপরিহার্য ক্রিকেট খেলোয়াড়, শহরের সেরা পাঁচজন অ্যাথলীটদের মধ্যে একজন, টেবিল টেনিসেও তার হাত দুর্দান্ত। এই মফস্বলে অবশ্য স্পেসিফিকেশনের বালাই নেই। কলকাতা হলে এত বহুমুখী প্রতিভা কল্কে পেত না। সেখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়ালড়ি। যে ক্রিকেট খেলে সে ক্রিকেটেই জান্ লড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে তাকানোর ফুরসত পায় না। যে ফুটবল খেলে তার দম ফুটবলের জন্যই নিংড়ে দিতে হয়। কিন্তু এ শহর তো কলকাতা নয়, এখানে খেলাধুলো কারো পেশাও হয়ে ওঠে না কখনো। এখানে যে-কেউ যা-খুশী খেলে এবং কেউ খুব বেশী ওপরে ওঠে না। ঝিন্টুর একটিই শখ আছে। গোটা পৃথিবী সাইকেলে ঘুরে আসবে।

সেবক রোডের দিকে মোড় নিতেই পেছনে একটা স্কুটার তাড়া করল।

ঝিন্টু মুখ ফিরিয়ে দেখল, অলক আগরওয়াল। তার দিকে একবার হাত তুলে হাসল। তারপর ধেয়ে এলো।

অল্প বয়সের এইটেই ধর্ম। স্পিড। আরো স্পিড। এবং কমপিটিশন। ঝিন্টু তার রেসিং সাইকেলটাকে উড়িয়ে দিল। পেছনে অলক।

আগের মতো সেবক রোড এখন আর ফাঁকা রাস্তা নয়। দোকানপাট, রিক্সায় ছয়লাপ। পদে পদে জ্যাম। তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝিন্টু গলে যেতে লাগল, ডাইনে বাঁয়ে আশ্চর্যরকম অ্যাঙ্গেলে হেলে এবং দোল খেয়ে খেয়ে। অলকের ছোটো চাকার স্কুটারে অতটা ব্যালেন্স নেই। পারল না।

কিছুদূর গিয়ে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে যায় ঝিন্টু। মাঝে মাঝে ভারী সব লোড-করা লরি মার-মার করে তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়, এগিয়ে যায় দ্রুতগতি গাড়িও। এগুলোর সঙ্গে ঝিন্টু পারবে না জানে। তবু সে সাইকেলটায় একটা দামাল গতি তুলে দেয়। সাইকেল আর ঝিন্টু, ঝিন্টু আর সাইকেল। একাকার।

২

পুরনো জেলখানার পাশে একটা লাশকাটা ঘর ছিল। কবে সেই ঘর ভেঙে দিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি। কিন্তু আশ্চর্য এই কংক্রিটের যে টেবিলটায় পোস্টমর্টেম হতো সেটা আজও দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে ভেঙে-পড়া দেয়াল, টুকরো ইঁট, ফাঁকে ফাঁকে আগাছা. তারই মধ্যে চারটে পায়ে আস্ত টেবিলটা দাঁড়িয়ে। চোখ পড়লেই বুকের ভিতরটা ঝাঁৎ করে ওঠে। সকলের হয়তো হয় না। পিণ্টুর হয়। আসতে যেতে রোজ তার ওইদিকে চোখ পড়ে। আজও পড়ল। চলন্ত রিক্সা থেকে সে অপ-লক চোখে কিছুক্ষণ দেখল, যতক্ষণ দেখা যায়।

এই টেবিলটাকে অনেকবার নানাভাবে সে স্বপ্ন দেখেছে। বাঁ দিকে কাছারি, কাছারির পাশে কাঁচা নর্দমা, ডানধারে জেলখানার উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের পাশেই ওই পুরনো লাশকাটা ঘরের ধ্বংসাবশেষ। এখানে সবাই আজকাল আবর্জনা ফেলে। দুর্গন্ধে নাকে রুমাল দিতে হয়।

একদিন পিণ্টুরও এই টেবিলে শুয়ে কাটাকুটি হওয়ার কথা ছিল। কপালটা কি তার একটু ফেবারে?

রাজনীতি ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে বা বেঁচে আছে বলে পিণ্টু বিশ্বাস করে না। কোনো-না-কোনোভাবে সব মানুষই রাজনীতি করে। কেউ জেনে, কেউ না জেনে। পিণ্টু বরাবর যা করেছে তা জেনেই করেছে। সে রাজনীতিতে নামে কলেজে থাকতে। তখন থেকেই তার খ্যাতি। কুখ্যাতিও। পিণ্টু এও বিশ্বাস করে, রাজনীতি করতে গেলে

কখনো-সখনো গা-জোয়ারির দরকার হয়, দরকার হয় সমাজবিরোধী মার্কামারা ছেলেদেরও। নিরামিষ রাজনীতি বলে কিছু নেই, কিছু হয় না। কাজেই সে রাজনীতিতে নেমেছিল আস্তিন গুটিয়েই। ফলে কলেজে থাকতেই মোটামুটি তাকে লোক ভয় খেতে শুরু করে।

ফুন্টসোলিং থেকে ফেরার পথে মধু চা-বাগানের কাছে চিরুর দল তাদের জীপে হামলা করেছিল। না-হক হামলা। পিন্টুর মাথায় রড লেগেছিল। জলপাইগুড়ি হাসপাতালে আসবার পথে কয়েক লিটার রক্ত বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। মরতে মরতে বেঁচে ফিরে আসে পিন্টু। তারপর চিরুর ওপর হামলা চালায়। কিছুদিন শহর খুব গরম করে রেখেছিল দুই পক্ষ। তখন মনে হয়েছিল হয় চিরু না হয় পিন্টু শিলিগুড়ি দখল করবে। কার্যত তার কিছুই হয়নি। চিরু এখন সরকারি ট্যুরিস্ট লজ আর এম-ই এস-এ মাছ মুরগী সাপ্লাইয়ের ঠিকাদারী করছে, বেচেছে দেদার বিদেশী জিনিস। আর পিন্টু? সে এখন তার বাবার জুনিয়র হয়ে ওকালতি জমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। জীবনের ধারাটাই অন্যভাবে বইতে লাগল। রাজনীতি হলো বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে থাকার মতো। যতক্ষণ পিঠে চেপে আছো ততক্ষণ ভালো, পড়লেই বাঘে খেয়ে নেবে।

পিন্টু এখন আর তেমনভাবে রাজনীতি করে না। সোজা কথায় বলতে গেলে, সে এখন কল্কে পায় না। তবে একসময়ে তার যে হাঁকডাক এবং প্রতাপ ছিল তার কিছু এখনো অবশিষ্ট আছে। লোকে তাকে হ্যাটা করে না। অনেকে সেলাম বাজায়।

পিন্টুর বয়স এখন ত্রিশ। নতুন করে জীবন শুরু করার পক্ষে বয়সটা এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু আসল সমস্যা হলো, নতুন জীবনটা গড়ে উঠবে কী নিয়ে? কিরকম ভাবে? রাজনীতি ছাড়া তার কাছে আর সব-কিছুই "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"-র মতো। সে জানে রাজনীতির জন্যই তার এই জীবনধারণ। কিন্তু সে এও জানে যে, রাজনীতির অচলায়তনে নতুন কোনো ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা তার আর নেই। দলে এখনো নাম

লেখানো আছে, দলের মিটিং-এ তার ডাকও পড়ে, কিন্তু একথাও ঠিক যে তাকে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হয় না আজকাল।

বেঁচে থেকেও নিজের মৃত্যু এইভাবেই প্রত্যক্ষ করে পিণ্টু।

কলেজের মোড়ে পানের দোকানের সামনে যে রিক্সা দাঁড় করাতে হবে তা রিক্সাওলা জানে। পিণ্টুকে নামতে হয় না, দোকানদার তাকে দেখেই পিলাপাতি কালাপাতি দিয়ে পান সেজে নেমে এসে এগিয়ে দেয়। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে

পিণ্টু এই শ্রদ্ধার ভাবটা খুব নজর করে দেখে। শ্রদ্ধা কোথাও কমে যাচ্ছে কি না, বা আর কারো প্রতি বেড়ে উঠছে কি না এটা তার জানা দরকার। এই যে রিক্সাওলাকে কিছু বলতে হয় না, শুধু পিণ্টু উঠে বসলেই রিক্সা নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে থাকে. পানের দোকানে দাঁড় করায় বা বাসায় নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেয় এর ব্যত্যয় হলেই পিণ্টুর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এসব ছোটোখাটো ঘটনা হলো মিটার। জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি মাপবার যন্ত্রবিশেষ।

এল আই সি, স্টেট ব্যাংক, সেলস ট্যাক্স. ইনকাম ট্যাক্স, কোর্ট. এস ডিও অফিস যেখানেই সে যায় কোথাও তার নিজেকে পরিচয় দিতে হয় না। পিণ্টু নিজে গিয়ে দাঁড়ালে বা পিণ্টুর নাম করে কেউ গেলে এখনো এই টাউনে অনেক কার্যোদ্ধার হয়ে যায়। মরা হাতি এখনো লাখ টাকা।

দোকানের অদূরে একটা গাছতলায় কয়েকজন ছেলেছোকরা গ্যাঞ্জাম করছিল। পিণ্টুকে দেখে এগিয়ে এলো।

পিণ্টুদা শুনেছেন ?

পিণ্টু বোঁটা থেকে একটু চুন চেটে নিয়ে বলে, কী ?

ফুডের চ্যাটার্জি সাহেব আবার কাল রাত থেকে ঘেরাও হয়ে আছে।

ফুড কর্পোরেশনের ম্যানেজার চ্যাটার্জিসাহেব প্রায়ই ঘেরাও হন। এ যুগের পক্ষে লোকটা নিদারুণ 'মিসফিট'। ঘুষটুস খান না, কর্মচারী-

দের একটু ডিসিপ্লিনে রাখতে চেষ্টা করেন, তার চেয়েও বড় কথা চুরি আটকানোর চেষ্টা করেন। ফলে মাসে দু-একবার তাঁকে ঘেরাও হতে হয়। খবরটা তাই নতুন নয় বটে, কিন্তু পিন্টুর খিঁচ অন্যখানে। খবরটা সে যথাসময়ে পায় নি। আজকাল টাউনে কোনো ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পিন্টুর কানে কেউ পৌঁছে দেয় না, আগে যেমন দিত। যে-কোনো ঘটনাতেই পিন্টুর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। আর আজকাল? সে সময়মতো কোনো খবরই পায় না।

সামনেই ফুড কর্পোরেশনের অফিস। পিন্টু রিক্সায় বসেই অফিসের সামনে ভীড় দেখতে পেল। খুব নিস্পৃহভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। ভেতরে কোনো তাগিদ অনুভব করল না। ফুড কর্পোরেশনের ইউনিয়নে চারটে ভাগ। বড় ভাগটা তাদের—অর্থাৎ তার দলের। কিন্তু কেউ তাকে ডাকেনি, তার পরামর্শ চায় নি।

পিল। আর কালাপাতি জর্দার ধার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। পিক ফেলে পিন্টু অস্পষ্ট গলায় বলল, চল।

রিক্সা চলতে থাকল।

৩

ব্রহ্মকুমার গাঙ্গুলীকে এ-শহরের সবচেয়ে বড় উকিল বলা যাবে কি না তা বলা মুশকিল, তবে তিনি যে সবচেয়ে বড়দের একজন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই শহরে সবচেয়ে বড় উকিলদের সংখ্যা খুব বেশীও নয়। মেরে কেটে চার-পাঁচজন। এবং তাঁদের মধ্যে সকলেই বৃদ্ধ এবং প্রবৃদ্ধ। উপেন বিশ্বাসের বয়স আশি ছাড়িয়েছে। তবু সক্ষম আছেন বলে কোর্টে প্রায় রোজই হাজিরা দেন। বেশীরভাগ সময়েই বসে ঝিমোন। মামলা চালায় জুনিয়ররা। নিরাপদ সরকার ছিয়াত্তরে পা দিয়েছেন। আজকাল আদালতে আসতে চান না। প্রায়ই ছেলের কাছে আমেরিকার হিউস্টনে চলে যান এবং কয়েকমাস করে থেকে আসেন। কেস প্রায় নেন না বললেই চলে। গৌর ব্যানার্জি কিছুটা অ্যাকটিভ। বয়স তিয়াত্তর। ব্রহ্মকুমারের একমাত্র সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রদ্যোৎ সেন তেমন বৃদ্ধ নন, মাত্র পঞ্চান্ন বা ছাপান্ন। উকিলও ভালো। কিন্তু শোকতাপ পেয়ে ইদানীং বড্ড নিঃঝুম হয়ে গেছেন, কোনো কাজেই উৎসাহ নেই।

আর যে সব উকিল আছে তারা উঠতি, ছলবলে খলখলে। এখনো কারোই ভালো পসার জমে নি। বুড়ো আর যুবোদের মধ্যে পেশাগত এই প্রজন্মের ফাঁকটুকুতে যে ভ্যাকুয়াম আছে সেখানেই ব্রহ্মকুমারের স্থান। তিনি যথেষ্টই রোজগার করেন, উদয়াস্ত তাঁর সময় নেই। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি তাঁর মেশিন চালু থাকে। তাঁর তেমন কোনো শখ নেই, আহ্লাদ বা প্রমোদ নেই, তিনি কোথাও ভ্রমণে যান না, চা ছাড়া

তাঁর কোনো নেশা নেই। তাঁর একটাই নেশা—মামলা। কত টাকা তিনি মাসে রোজগার করেন তার সঠিক হিসেব তাঁর নিজেরও জানা নেই। তবে কম করেও দশ থেকে পনেরো হাজারের মধ্যে। টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে, জমা হচ্ছে না খরচ হয়ে যাচ্ছে তা তাঁর স্ত্রী বলতে পারবেন। তিনি কিছুই জানেন না সংসার কীভাবে চলে। স্ত্রীই সব কিছু চালিয়ে নেন, সংসারকে এবং তাঁকেও। তিনি আজকাল সুখাদ্যের স্বাদ টের পান না, সুন্দরী ও কুৎসিত নারীর তফাৎ বুঝতে পারেন না, মাত্র ঊনষাট বছর বয়সেই তাঁর কামবোধ লুপ্তপ্রায়।

সকাল বেলায় ব্রহ্মকুমার তাঁর বাইরের ঘরে বসেই তার চতুর্থ পুত্র পিণ্টুকে গালাগাল করছিলেন, অপদার্থ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, ফাজিল, ভূত। তার কারণ জলপাইগুড়িতে পরশু দিন একটা মামলার হিয়ারিং ছিল। কথা ছিল পিণ্টু কেসটা অ্যাটেণ্ড করবে। কিন্তু সে তা করে নি এবং সে কথা বাপকে জানায়নি পর্যন্ত।

মক্কেলদের দিকে চেয়ে ব্রহ্মকুমার বলছিলেন, এই এবাই সব আধুনিক কালের ছেলেমেয়ে। এদের হাতে দেশ আর দশের ভার দিয়ে যেতে হবে আমাদের। বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ বছর পর দুনিয়াটার কী হাল হবে ভাবতে পারেন?

জলপাইগুড়ির মক্কেল করুণভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল একধারে। ফাঁক পেয়ে বলল, সামনের পনেরো তারিখে ডেট পড়েছে। এবারটায় আপনি নিজে যাবেন তো উকিলবাবু?

যেতেই হবে। তুমি তেরো চৌদ্দ তারিখে একবার তাগিদ দিয়ে যেও। আর মুহুরির কাছে আমার এনগেজমেণ্ট বুক আছে, তাতে শুনানির তারিখ আর নামধাম লিখে রেখে যাও। কোনোরকমে যাতে ভুল না হয়। মামলার ব্যাপারে ব্রহ্মকুমারের ভুল হয় কদাচিৎ, তিনি তো এই প্রজন্মের দায়দায়িত্বহীন বাপের হোটেলের অন্নধ্বংসকারী ছেলেছোকরা নন। যখন বিয়ে করেছিলেন তখনো ল'য়ের ছাত্র, রোজগারের নামে ঢুঢু, তবু বাপের

হুকুমে টোপর পরতে হয়েছিল। বাপের হুকুম কী জিনিস তা এরা সব বুঝবে না, তখন বাপই ছিল আইন, বাপই সুপ্রিম কোর্ট, প্রিভি কাউন্সিল। খেঁদী পেঁচী কাকে গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন বিগ বস তা বুঝতে পারছেন না বলে ভয়ে শুভ দৃষ্টির সময় চোখ পর্যন্ত খোলেন নি। আর এই পিন্টুকে বিয়ে করার কথা বলে বলে মুখে ফেকো উঠে গেল, কথাটা শুনতে পায় বলেই মনে হয় না। অথচ ছেলেটার বিয়ে দরকার। রাজনীতি করতে গিয়ে দাগা খেয়েছে, আইনেও মন নেই। এই অবস্থায় বিয়ের বাড়া ওষুধ নেই। কিন্তু ওষুধ না গিললে কী করবেন তিনি?

বাচ্চা চাকরটা এসে খবর দিল, মা একটু ডাকছেন বাবু।

ব্রহ্মকুমার আঁৎকে উঠে বললেন, এখন ডাকছে কী রে? কত মক্কেল রয়েছে দেখছিস না।

আজ্ঞে খুব দরকার।

পরে হবে, পরে, এখন যা।

চাকরটাকে ব্রহ্মকুমার স্টেশন থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। উত্তর বঙ্গের বছরওয়ারি বন্যায় বছর চারেক আগে গোটা পরগনা ভেসে গিয়েছিল। শিলিগুড়ি উঁচু ভিতের শহর, কখনো ডোবে না, রাজ্যের লোক এসে পঙ্গপালের মতো ঝাঁপ ফেলল শহরে। স্টেশন, গুমটি, চালা, স্কুল কলেজ সব জায়গায় লোক। সেই সময় পুরোনো বাজার থেকে মাসকাবারী বাজার করে ফেরার পথে স্টেশনে এ এস এম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশকাল পরিস্থিতি নিয়ে দুটো কথা বলছিলেন দাঁড়িয়ে। বাচ্চা একটা সাত আট বছরের গোপাল-গোপাল চেহারার ছেলে কাছেই দাঁড়িয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে কাঁদছিল। ছেলেটার দিকে বিরক্ত চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন ব্রহ্মকুমার। এমন সময় পাশেই একটা দঙ্গল থেকে একটা আদুড় গা লোক বিগলিত মুখে এগিয়ে এলো। গায়ে-পড়া অসহ্য রকমের আলাপী কিছু লোক আছে দুনিয়ায়। এদের আস্পদ্দার শেষ নেই। হুট বলে যখন-তখন শ্রেণীভেদ ভুলে যার তার সঙ্গে মনের কথা বলতে লেগে যায়।

এ লোকটাও তেমন। চক্রবর্তী আর তাঁর কথা হচ্ছে, মাঝখানে উদয় হয়ে লোকটা বলল, এই যে ছেলেটা দেখছেন না বাবু এর বাপ নেই মা একটা পাগলী। তা ছিল মায়ে পোয়ে একরকম, কিন্তু আজ সকাল থেকে মা-টারও তল্লাস নেই। কোথায় চলে গেছে পাগল মানুষ। ছেলেটা কেঁদে কেটে সারা হচ্ছে। তা বাবু নেবেন নাকি ছেলেটাকে ? ঘরে দোরে থাকবে, কাজকম্ম করবে, মানুষ হয়ে যাবে একরকম।

ব্রহ্মকুমারের রেগে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু একটু সংসারী বুদ্ধি তখন খেলল মাথায়। তাঁর স্ত্রীর একটু বাতের লক্ষণ আছে। হাঁটু আর পায়ে কোনো বাচ্চা ছেলে উঠে মাড়িয়ে দিলে আরাম পান। কিন্তু সেরকম বাচ্চা তাঁর বাড়িতে কেউ নেই। এটাকে নিলে সেই কাজ হয়। লোকটাকে ব্রহ্মকুমার জিজ্ঞেস করলেন, জাতে কী রে ?

আজ্ঞে, বারুজীবী। ভালোই, জলচল।

গার্জিয়ান কেউ নেই ?

আমি গ্রাম সম্পর্কে কাকা। আর কেউ নেই।

ব্রহ্মকুমার লোকটার নামধাম টুকে নিলেন। তারপর ছেলেটাকে নিয়ে এলেন বাসায়। প্রথম প্রথম তিন চারদিন খুব কাঁদত। খেতে চাইত না, খেলতে চাইত না। পরে আস্তে আস্তে এমন বশ মানল যে আর বলার নয়। ভেলু না ফেকু কী একটা নাম যেন ছিল আগে। এ বাড়িতে আসার পর নাম দেওয়া হয়েছে জনার্দন। ছেলেটা একটু খেতে ভালবাসে। কোমরের কষি খুলে খায়। ভোজনে চ জনার্দন স্মরণ করে ওই নামটা বোধহয় পিন্টুই দিয়েছিল। সেই থেকে জনার্দন।

মায়া মোহের কথা শাস্ত্রে যা বলা আছে তা যে অতিশয় খাঁটি তা উকিলবাবু বেশ টের পান। এই জনার্দনকে দিয়েই টের পান। কুড়িয়ে পাওয়া এই ছেলেটার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, কিছু নেই তবু একটা ভারি মায়ার টান এসে গেছে। এখন যদি জনার্দনের মা এসে ছেলেকে দাবী করে বসে তবে ছাড়তে ভীষণ কষ্ট হবে।

ব্রহ্মকুমার জনার্দনের দিকে চেয়ে বললেন, তোর মার এমন কি জরুরী দরকার বল তো যে মক্কেল ছেড়ে যেতে হবে ?

জনার্দন মাথা নেড়ে বলল, সে জানি না।

এক মক্কেল আগ বাড়িয়ে বলে উঠল, শুনেই আসুন না উকিলবাবু, আমরা বসছি।

বসুন তাহলে। বলে ব্রহ্মকুমার উঠলেন, বেলা প্রায় পৌনে দশটা হলো। কোর্টে একটু বেলা করেই যান। তবু তারও বেশী সময় নেই।

৪

সুমনা জানেন, স্বামীটিকে ডেকে তেমন কোনো লাভ নেই। কারণ খুব ঝুঁদে উকিল হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মকুমারের বাস্তব বুদ্ধি অতিশয় সীমাবদ্ধ। বিপদের সময় ব্রহ্মকুমারের একমাত্র ভূমিকা হলো চেঁচামেচি করে অন্যদের ডাকাডাকি করা। এবং অবাস্তব সব পরামর্শ দেওয়া।

বিপদ বলতে অবশ্য তেমন কিছু নয়। তার মেজো বউমার ব্যথা উঠেছে। সুমনা নিজে বহুবার মা হয়েছেন। কাজেই অভিজ্ঞতার অভাব তাঁর নেই। এ অবস্থায় কী করতে হয় না-হয় সবই তাঁর নখদর্পণে। তাছাড়া কেষ্ট মিত্রের নার্সিং হোম-এ নাম লেখানো আছে।

কিন্তু মুস্কিল হলো তাঁর মেজো বউমা সোমার হার্ট ভালো নয়। কলকাতার বড় ডাক্তারও দেখে বলেছে, বেশী ধকল সইতে পারবে না। সন্তান প্রসব না করলেই ভালো।

ডাক্তারদের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে জীবন অচল। সুতরাং তা কদাচিৎ মানা হয়।

কিন্তু সুমনা ভাবছেন, এক্ষেত্রে মানাই বোধহয় ভালো ছিল। ব্যথা ওঠার পর থেকেই সোমার প্রচণ্ড শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। বুকে ভীষণ ধড়ফড়ানি এবং ক্ষীণ একটু ব্যথাও। ছেলেরা কেউ বাড়ি নেই। ভরসা জনার্দন আর ব্রহ্মকুমার। শুধু নার্সিং হোম-এ নিয়ে ফেলে রেখে আসলেই চলবে না, ব্যাপারটা বুঝেও আসতে হবে। বড় বউমা মঞ্জরী কাছে থাকলেও খানিকটা ভরসা পেতেন সুমনা। সে গেছে লাটাগুড়ি চা-বাগানে বাপের

বাড়ি, তার মায়ের এখন-তখন অবস্থা বলে আজ সকালেই ভাই এসে নিয়ে গেল। দুই ছেলে আর এক মেয়েকে রেখে গেছে। এখন তারাও সবাই স্কুলে।

চিনচিনে ব্যথাটা উঠতেই সোমাকে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করিয়েছেন তিনি। এ সময়ে হাঁটাহাঁটি করলে প্রসব সহজ হয়। কিন্তু ভেতরের বারান্দায় কয়েকবার এপাশ ওপাশ করেই সোমা বুক চেপে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছে। ঝিন্টুকে পাঠিয়েছেন বিট্টুকে খবর দিতে। কিন্তু সেও এসে পৌঁছোয় নি এখনো। সুমনা পরিস্থিতিটা ভালো বুঝছেন না।

ব্রহ্মকুমার ব্যস্তবাগীশ লোক। চোখ কপালে তুলেই বাইরের ঘর থেকে ধেয়ে এসে বললেন, কী হয়েছে কী? তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময় নেই।

শোনো, চেঁচামেচি কোরো না। বউমার ব্যথা উঠেছে।

ব্যথা!

প্রসবের ব্যথা। বাড়িতে ছেলেরা কেউ নেই। তুমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো। এক্ষুণি।

কথাটা শুনেই ব্রহ্মকুমার চেঁচাতে লাগলেন, কোথায় থাকে সব নবাব-নন্দনেরা? কোথায় যায়? এটা কি হোটেলখানা নাকি? এখন হার্ট ফেল-টেল করলে কে দায়ী হবে?

সুমনা স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে তাঁকে ভস্ম করে দেওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করে বললেন, ষাঁড়ের মতো চেঁচালে বউমার আরো শরীর খারাপ হবে, খেয়াল আছে?

ব্রহ্মকুমারও স্ত্রীর দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, তোমরা আমাকে পেয়েছোটা কী বলতে পারো? এক ঘর মক্কেল ছেড়ে এখন আমি ছুটব গাড়ি আনতে?

তাতে দোষটা কী হলো? মক্কেলরা কেউ পালাবে না। সারা জীবন কেবল মক্কেল মক্কেল করে গলা শুকোলেই তো হবে না। সংসারে আরো পাঁচ

জনের প্রতি কর্তব্যও আছে।

ব্রহ্মকুমার আদালতে সওয়াল জবাব মারফৎ রোজই বিস্তর ঝগড়া কাজিয়া করে থাকেন। বস্তুতপক্ষে মামলা মানেই তো দু পক্ষের ঝগড়া। সেই ঝগড়ায় তিনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জেতেনও। কিন্তু মুস্কিল হলো সংসারের ঝগড়ায় তিনি কিছুতেই এঁটে ওঠেন না। সেইজন্য পারতপক্ষে সুমনার সঙ্গে তিনি বিতর্ক এড়িয়ে চলেন। কিন্তু ঝগড়া না করলেও রোষকষায়িত লোচনে স্ত্রীকে বিদ্ধ করতে ছাড়েন না ব্রহ্মকুমার। বলেন, কর্তব্য কেবল এক আমারই? বাঃ, বেশ।

সুমনা ব্রহ্মকুমারের রোষদৃষ্টিকে একটুও গ্রাহ্য না করে বললেন, সংসারের দায়-দায়িত্ব আমি ঘাড়ে না নিলে বাইরের ঘরে বসে ঠ্যাং নাচানো বেরিয়ে যেত। কিন্তু এখন এত কথার সময় নেই, ঘরে সিরিয়াস রুগী। দয়া করে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো।

ব্রহ্মকুমার বিরক্তির গলায় বলেন, গৌর কন্ট্রাকটরকে তো বলাই আছে তার গাড়িটা দরকার হতে পারে। কাউকে দিয়ে তাকে একটু খবর পাঠালেই তো হয়।

সুমনা মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। একটু রাগাও হলেন কি? গলাটা এক পর্দা নেমে গেল। বললেন, গৌর তোমার পেয়ারের লোক, তুমি খবর পাঠাও গে। কিন্তু সে থাকে সেই এক নম্বর ডাব গ্রামে, মাইল তিনেক দূর! অতদূর গিয়ে গাড়ি আনতে আনতে ভালোমন্দ একটা কিছু না হয়ে যায়।

তাহলে?

তাহলে কী সেটা জানার জন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠালাম। একটু বেরিয়ে দেখ কাছাকাছি কারো গাড়ি পাও কিনা। রিক্সায় নিয়ে যেতে আমার সাহস হয় না। তোমার মক্কেলদের কারো গাড়ি-টাড়ি নেই?

ব্রহ্মকুমার হঠাৎ উদ্ভাসিত হন। তাই তো। জলপাইগুড়ির মক্কেলটি যতদূর মনে হয় গাড়ি করেই এসেছে। লোকটা এখনো চলে যায় নি

বোধহয়।

দেখছি। বলে ব্যস্তসমস্ত ব্রহ্মকুমার বেরিয়ে গেলেন। জলপাইগুড়ির মক্কেল বারান্দায় মুহুরির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় এনগেজমেণ্ট বুক-এ মামলার তারিখ লেখাচ্ছে। সেরকমই কথা।

লোকটার নাম মনে পড়ল না। ব্রহ্মকুমার বললেন, ওহে—

লোকটা ফিরে তাকাল, আমাকে বলছেন ?

ইয়ে, আপনার গাড়ি আছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই তো।

ব্রহ্মকুমার দেখলেন, নতুন ঝকমকে অ্যামব্যাসাডার।

ইয়ে, আমার পুত্রবধূকে একটু নার্সিং হোম-এ নিয়ে যেতে হবে। সিরিয়াস অবস্থা।

মক্কেল ব্যস্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৌঁছে দিচ্ছি। এ আর বেশী কী কথা ? আড়াল থেকে সুমনা দৃশ্যটা দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ি পাল্টাতে গেলেন। সোমার ঘরে উঁকি মেরে দেখলেন, বউটা নিঃঝুম হয়ে পড়ে আছে।

বউমা।

উঁ ?

চলো। একটু তৈরি হয়ে নাও। গাড়ি যোগাড় হয়েছে।

একটু কাতর শব্দ করে উঠল সোমা।

কেমন লাগছে বউমা ?

বুকের ভেতরটায় ভীষণ ভার।

শাড়ি কি আমি পরিয়ে দেবো ?

না। পারব।

তাহলে আর দেরি কোরো না। আমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

ব্রহ্মকুমার আবার গিয়ে বাইরের ঘরে বসেছেন। সুমনা একখানা পাট-ভাঙা শাড়ি পরতে পরতে স্বামীর কথা ভাবছিলেন। যা রোজগার তাতে

একটা গাড়ি কেনা কিছু শক্ত নয় ব্রহ্মকুমারের পক্ষে। বাড়িতে একটা টেলিফোনও বড্ড দরকার। কিন্তু এসব প্রয়োজনের কথা ব্রহ্মকুমার কানে তোলেন না। কথা উঠলেই বলেন, ওসব স্ট্যাটাস সিমবল-এ আমার দরকার নেই।

টাকা-পয়সা অবিশ্যি সবই সুমনার হেফাজতে। কিনলে তিনিই কিনতে পারেন। কিন্তু নিজেকে ততটা স্বাধীন বলে আজও ভাবতে শেখেন নি সুমনা। ব্রহ্মকুমারের মতো না হলে সেটা সম্ভব নয়। শুধু গত বছর অনেক বলে কয়ে মত আদায় করে একটা ফ্রিজ কেনা সম্ভব হয়েছে মাত্র। আর গ্যাসের উনুন। সংসার এখনও ব্রহ্মকুমারের আয়েই চলে। বড় দুই ছেলে রোজগার করে বটে কিন্তু এখনো তেমন উল্লেখযোগ্য রকমের টাকা সংসারে দেয় না। না দিলে সুমনা কীই বা করতে পারেন?

শাড়ি পরা হয়ে গেল। সোমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন; বউমা হলো?

হয়ে এল মা। ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছি।

ঠাকুর প্রণাম করে যাও এসে। মক্কেলের গাড়ি, বেশীক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা চলবে না।

জনার্দনকে ডেকে বললেন, রান্না অর্ধেক করে রেখে যাচ্ছি। আজ বাবুর খাওয়ার খুব কষ্ট হবে। মাছ ভাজা আর ডাল দিয়ে ভাত দিস। গাছ থেকে একটা গন্ধ লেবু এনে কেটে দিস। দেখিস, সর্দারী করে আবার গ্যাস জ্বালাতে যাবি না খবর্দার। আর একবার সিলিণ্ডার বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলি মনে আছে তো!

তুমি এবেলা ফিরবে না মা?

ফিরব বৈকি। পৌঁছে দিয়েই ফিরব। সব একটু দেখেশুনে রাখিস বাবা। আর বিটু ফিরলে বলিস তখনই যেন নার্সিং হোম-এ চলে যায়।

নতুন গাড়িটার অভ্যন্তরে যখন উঠে বসলেন সুমনা তখন তাঁর একটু হিংসে হলো। এরকম একখানা গাড়ি ব্রহ্মকুমার অনায়াসেই কিনতে পারেন। কিন্তু লোকটার বড় জেদ, বড় গোঁ। যেন গাড়ি কিনলেই

ট্র্যাডিশন ভাঙা হবে, বড়লোকী দেখানো হবে আর ছেলেদের অধঃপাতে যাওয়ার রাস্তা করে দেওয়া হবে।

বিটুকে দোকান থেকে তুলে নেবেন কিনা একবার ভাবলেন সুমনা। কিন্তু ভেবে মনে হলো, কাজটা যুক্তিযুক্ত হবে না। বৌয়ের প্রতি বিটুর বিশেষ দায়িত্ববোধ আছে বলে সুমনার মনে হয় না। তাছাড়া ওর সঙ্গে গিয়ে কীই বা করবে? সোমার সঙ্গে বিটুর বিয়ে দেওয়াটা হয়তো ভুলই হয়েছে। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় আর পাত্রী খুঁজেও পাওয়া গেল না। দিয়ে না দিয়েও উপায় ছিল না। বেশীর ভাগ পরিবারেই একটু আধটু কেলেংকারী থাকে। বড় বউমা মঞ্জুরী আর মেজো ছেলে বিটু এই সাদামাটা পরিবারে সেই দাগটাই দেগে দিতে গিয়েছিল প্রায়। মণ্টুর সঙ্গে মঞ্জরীর সবে বিয়ে হয়েছে তখন। বছর না ঘুরতেই দেওর আর বউদির সম্পর্কটা বড্ড বেশী ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে পড়েছিল। মণ্টু চাকরি করত মালদায় স্টেট ব্যাংকে। আসা-যাওয়া ছিল। তবে টানা থাকত না। বউ নিয়ে যাওয়ারও খুব আগ্রহ ছিল না। মণ্টু একটু অন্যরকম। সাধু-সাধুভাব। অবসর পেলেই ধর্মের বই পড়ে। সাধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। মঠে মন্দিরে যায়। একা একা গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারবদ্রী, কাশী গয়া ঘুরে বেড়ায়। ওই ছেলের বউ যদি এদিক ওদিক করে তবে আর সুমনা দোষ দেবেন কাকে। আর বিটু তখন দুর্দান্ত পুরুষ। ব্যাডমিন্টনে জেলার চ্যামপিয়ন। বেঙ্গল চ্যামপিয়ানশিপে খেলে রানারস আপ হয়ে এসেছে। তাছাড়া চোখা, চালাক, ছলবলে যুবক। সিনেমায় নামবার জন্যও তোড়জোড় করেছিল। এ ছেলের সঙ্গে যে কোনো যুবতীর ঢলাঢলি খুব স্বাভাবিক। দোষের মধ্যে বিটুটার লেখাপড়া তেমন এগোয় নি। বি. এস-সিটা কিছুতেই পাশ করতে পারল না। তাতেও বাধেনি। একদিন মঞ্জরীর কোলে মাথা রেখে বুঝি শুয়ে ছিল সন্ধেবেলায়। অন্ধকার ঘরে ফোঁপানির শব্দ পেয়ে জানালার ফোকর দিয়ে দৃশ্যটা দেখে ফেলে যূথী। যূথী এসে মাকে টেনে নিয়ে গিয়ে দৃশ্যটা দেখায়। অন্ধকার বলে তেমন

কিছু দেখতে পান নি সুমনা। তবে কিছু গাঢ় কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন।

বিটুর একটা অসাধারণ গুণ আছে। মাতৃভক্তি। পারতপক্ষে কখনো সে সুমনার অবাধ্য হয় নি কখনও। খুব শিশুবেলা থেকেই সে মায়ের ন্যাওটা। সুমনা বিপদ দেখে ছেলের সেই দুর্বলতা কাজে লাগালেন। বিয়ের প্রস্তাবে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল বিটু। রাগারাগিও করেছিল। কিন্তু সুমনা নাওয়া খাওয়া ছেড়ে শয্যা নেওয়ায় আর বেশী প্রতিরোধ করতে পারে নি। হয়তো সে বুঝেছিল যে, বউদির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা বাড়ির লোকে জানে। মত দিতেই পাত্রী খোঁজা হয়েছিল ঝড়ের বেগে। সোমা চা-বাগানের মেয়ে। মা-বাবা নেই, মামার কাছে অনাদরে মানুষ। বড় মায়া হয়েছিল মেয়েটাকে দেখে।

মায়া এখনো একটু আছে। বিটুটা বড় অনাদর করে ওকে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বিয়ে, তা সফল হয়েছে সন্দেহ নেই। মঞ্জরী আর বিটু একই বাড়িতে আজও বাস করে। কিন্তু দুজনেই পরস্পরের প্রতি একেবারেই উদাসীন। বিটুর ব্যাডমিণ্টন গেছে, দুরন্তপনা গেছে, স্মার্টনেস গেছে। বিয়ের পর থেকেই কেমন যেন আনমনা, কেমন যেন ছন্নছাড়া ভাব ওর। সেই বিটুকে আর চেনা যায় না। ব্রহ্মকুমার একটা দোকান করে দিয়েছেন বিটু এখন সেই দোকান নিয়েই পড়ে থাকে।

সোমা খুব ক্ষীণ স্বরে কোঁকাচ্ছিল। সুমনা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, খুব কষ্ট হচ্ছে?

বুকটা কেমন করছে মা।

ব্যথাটা?

তেমন নয়। শুধু চিন চিন করছে।

ব্রহ্মকুমারের মক্কেল সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসা। মুখ ঘুরিয়ে তাদের দিকে একবার চেয়ে বলল, মিত্র সাহেবের নার্সিং হোম তো! এসে গেছি। সুমনা বউমাকে নিয়ে নামলেন।

৫

স্টকে অনেক জিনিস নেই। আনতে হবে। দুটো বেবি ফুড. একটা সিরিয়াল, দু রকম হোল মিল্ক, দু ধরনের ক্রিম, একটা বিশেষ ব্র্যাণ্ডের বিস্কুট, একটা বিশেষ কোম্পানীর মাখন, তিন পপুলার ব্র্যাণ্ডের ব্লেড, আরও অনেক রকম জিনিস। চালু জিনিস টপ করে বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু আনাতে গেলেই দেখা যায়, প্রতি পিস জিনিসের ওপর কিছু দাম চড়িয়ে বসে আছে পাইকার, আজকাল জিনিসের দাম বাড়ে মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে। ম্যানুফ্যাকচারার বা পাইকারকে পাবলিক ফেস করতে হয় না। খুচরো খদ্দেরদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয় রোজ এই তার মতো খুচরো দোকানদারদের।

এই তো গত সপ্তাহে তিনটাকা ডজন দরে ব্লেড নিলাম। এর মধ্যেই সাড়ে তিন।

কোমপানি দাম বাড়ালে আমরা কী করব বলুন।

কই সম্পদ স্টোরে তো বাড়েনি। এই তো কালই কলেজের নয়নবাবু তিন টাকা দরে কিনে নিয়ে গেলেন।

কিংবা ··

মশাই কি ব্ল্যাক করছেন নাকি?

কেন বলুন তো!

বেবি ফুডটার তো টিনের গায়েই লেখা আছে রিটেল প্রাইস নট টু একসিড—

লেখা তো থাকেই। আমরাও জানি। কিন্তু হোলসেলার যদি বেশী নেয়— না মশাই, এটা একটা কথার কথাই নয়। এ সোজা ব্ল্যাক।

সারাদিনই বিটু এবং বিটুর মতো দোকানদারকে মুখ বাজিয়ে যেতে হয়। কতগুলো স্টক কথা আছে। সেগুলোয় কাজ না হলে মিনমিন করতে হয়। পুরোনো স্টক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ একরকম। নতুন স্টক আনলেই হাঙ্গামা। লোকে বোঝে না একটা চালু দোকানের দোকান-দার অনর্থক বেশী দাম চেয়ে নাম খারাপ করতে চায় না। তাই বিটুকে ফের মুখের তুবড়ি ছোটাতে হয়।

বিটু কি ক্লান্তি বোধ করে? হতাশা? বিরক্তি?

না। বিটু জানে সে আর কোনোদিনই ভারতের এক নম্বর ব্যাটমিন্টন খেলোয়াড় হতে পারবে না। বিটু জানে সে আর কখনো হতে পারবে না কোনো সিনেমার নায়ক। বিটু জানে পৃথিবীর ভালবাসা বলে আর কিছু নেই। আছে শুধু অন্তহীন কেনা বেচা। আছে লাভ লোকসান নামক কিছু উত্তেজনা।

প্রবীর।

বলুন বিটুদা।

বিটঠলভাইয়ের আড়তে গিয়ে মালগুলো একটু নিয়ে আয়। লিস্ট করে রেখেছি।

যাচ্ছি।

স্টক মিলিয়ে দেখেছিস তো! আর কিছু লাগবে?

এ সপ্তাহটা চলে যাবে। গ্লিসারিন সাবানটা কম আছে। ন্যুডলসের প্যাকেট আর নেলপালিশটাও।

লিস্টে ওগুলোও লিখে নে। পরের সপ্তাহে দাম বাড়তে পারে। স্টক রাখা ভালো। আর সম্পদ স্টোর্সে ব্লেডের দামটা জেনে আসিস তো। তিন টাকা ডজন দিচ্ছে কী করে পৌনে তিন টাকায় কিনে?

ঠিক আছে। বলে প্রবীর নামক উনিশ কুড়ি বছরের দীন এবং বিনয়ী

চেহারার ছেলেটি খুব নরম স্বরে বলে, একবার বাড়ি যাবেন না দাদা ?

বাড়ি ! কেন ?

ঝিণ্টু কী বলে গেল শোনেননি ?

ঝিণ্টু ! ওঃ !

একবার যাবেন না ?

এখন না। যাব'খন। তুই মালগুলো নিয়ে আয়।

দশটা বেজে গেছে। অফিস-কাছারি, স্কুল কলেজ বসে গেছে। এই সময়টায় খদ্দের কিছু কম। গিন্নীবান্নী গোছের কয়েকজন খদ্দের আসতে পারে। তাদের সুখময়-ই সামলাতে পারবে। দোকানটা আগের চেয়ে একটু বড় হওয়াতে এখন দুজন সেলসম্যান রাখতে হয়েছে বিটুকে। সুখময় নতুন। বয়স কম, একটু অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে দাম বলতে ভুল করে। ওজন করার হাতও পাকা নয়। তাছাড়া বড্ড কামাই করে। ওর ভরসা বড় একটা করা উচিত নয়। তবে এ সময়টায় সুখময়ই সামলাতে পারবে।

বিটু সকালে দোকানে আসে বলে বাড়িতে খবরের কাগজ পড়ার সময় পায় না। তাই দোকানে সে একখানা করে কাগজ রাখে। শিলিগুড়িতে কলকাতার খবরের কাগজ আসে বিকেলের দিকে প্লেনে। কাজেই বিটুকে স্থানীয় দৈনিকটি রাখতে হয়। চার পৃষ্ঠার কাগজ তবে সব রকম খবরই থাকে একটু সংক্ষিপ্ত আকারে।

প্রথম পৃষ্ঠায় বিটুর পড়ার কিছু নেই। রাজনীতি, বক্তৃতা আর দুর্ঘটনার খবর। সে খোলে খেলার পৃষ্ঠা। ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশীপে প্রকাশ পাড়ুকোন সেমি ফাইন্যালে হেরে গেল।

এখন তার নিজেরই বিশ্বাস হয় না যে, অনেকদিন আগে জব্বলপুরে সে এই প্রকাশের সঙ্গে খেলেছিল। খুবই ভালো খেলেছিল সে। তবে স্ট্রেট সেটে হারতে হয়েছিল তাকে। কেন হেরেছিল তা হারের দিন বুঝতে পারেনি সে। নিজস্ব অ্যাটাকিং গেম খেলে সে অগ্নীবর্ষী সব স্ম্যাশ-এ

মাটি কাঁপিয়ে দিয়েছিল সেদিন। পায়ের কাজও ছিল ভালো। প্লেস করেছিল নানা কোনে বুদ্ধি খাটিয়ে। কিন্তু মুস্কিল হলো প্রকাশ একটুও অ্যাটাকিং গেম খেলেনি শুধু অনায়াস দক্ষতায় তার স্ম্যাশগুলো তুলে তুলে দিচ্ছিল। বারবার লম্বা মার মেরে তাকে ঠেলে দিচ্ছিল বেস লাইনে। স্ম্যাশ করে তার ফলো-আপ করতে গিয়ে বেদম হয়ে পড়ছিল বিটু। দ্বিতীয় গেম-এই বুঝতে পেরেছিল তার বিরুদ্ধে খেলছে একটি রোবট। রোবট ক্লান্ত হয় না, ঘাম ঝরায় না, রোবটের খেলায় আছে নির্ভুল ধারাবাহিকতা। বিটু পারবে কেন ? বহুদিন ধ'রে খেলাটা বিশ্লেষণ করে দেখেছে সে। আধুনিক ব্যাডমিণ্টনে বা যে কোনো খেলারই মূল কথা হলো স্ট্যামিনা, ফিটনেস এবং কন্ট্রোল। প্রকাশের সঙ্গে, দাপু বা রমেন ঘোষ, পার্থ গাঙ্গুলী বা অরুণ ব্যানার্জি কার সঙ্গেই বা খেলেনি বিটু ? বিভিন্ন টুর্নামেণ্টে এক আধজন অল ইণ্ডিয়া খেলোয়াড়কে সে প্রায়ই পেয়ে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। খুব বড় অঘটন ঘটাতে না পারলেও এক আধবার জিতেও গেছে। বেঙ্গল চ্যামপিয়নশীপের সেমি ফাইন্যালে সে হারিয়েছিল তৎকালীন চ্যাম্পিয়নকে। ফাইন্যালে হেরে গেল উঠতি যে খেলোয়াড়ের কাছে সেই খেলোয়াড় টানা তিন তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

সুখময় এক কাপ চা এনে সামনে রাখল।

বিটু চায়ে একটা চুমুক দিয়ে প্রকাশের খবরটা আবার পড়ল।

বিদেশে সত্যজিৎ রায় যদি প্রাইজ পায়, রবিশংকর যদি বাহবা কুড়োয়, প্রকাশ পাড়ুকোন যদি জেতে, হকিতে যদি ভারত সোনা আনে অলিম্পিক থেকে, ক্রিকেটে যদি ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারায় এবং গাভাসকার যদি ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙে একমাত্র তখনই নিজেকে কিছুক্ষণ ভারতীয় বলে মনে হয় বিটুর। আর কোনো সময়ে এটা হয় না।

এখনও হচ্ছিল না। প্রকাশ সেমিফাইনালে হেরে গেছে। হেরে তো বিটুও যেতে পারে। হারার জন্য তো প্রকাশকে পাঠানো হয়নি!

আরে আসুন ভট্‌চাযিয দা। কী খবর?

একটা মশার ক্রিম দাও তো বিটু। তোমার খবর কী?

এই তো, চলে যাচ্ছে।

গেলেই ভালো। তোমার বউয়ের কি বাচ্চা কাচ্চা হবে নাকি?

বিটু একটু বিনয়ের হাসি হাসল।

ভট্‌চায ওডোমসের দাম দিতে দিতে বলে, এই তো প্রথম, না?

না। আগেও একবার ইয়ে হয়ে গেল।

আহা রে। সবই ভবিতব্য।

আপনার কলকাতা যাওয়ার একটা কথা শুনেছিলাম না?

আজই যাচ্ছি। আর সেইজন্যই তো ওডোমস কেনা। বুঝলে আজকাল ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে পর্যন্ত দারুণ মশার উৎপাত।

জানি। আগে ছিল ছারপোকা।

আজকাল মশা। কলকাতাতেও ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে মশা। আগে মফস্বলে মশা ছিল, কলকাতায় ছিল না। আজকাল উল্টো। কেন জানো?

না।

গাঁয়ে গঞ্জে ফসলের পোকা মারতে বিষ দেয়, তাতে মশাও সাফ হয়ে গেছে। কলকাতায় তো আর তা নেই। যে শালার বিয়েতে যাচ্ছি সে থাকে যাদবপুরে। সেখানে যে কী মশা না দেখলে বিশ্বাস করবে না। গত পুজোয় গিয়েছিলাম, রোদে বসে দাড়ি কামাচ্ছি, দেখি পায়ের পাতায় একসঙ্গে সার দিয়ে দশ থেকে বারোটা মশা বসে ভোজ খাচ্ছে। বিটু বিনয়ের সঙ্গে হাসল। আগড়ম বাগড়ম কথা দোকানীকে শুনতেই হয়। নিয়ম।

যাওয়ার সময় ভট্‌চায্ বলে গেল, দেশে অ্যাডমিনস্ট্রেশন বলে আর কিছু নেই, বুঝলে। যা কণ্ডিশন তৈরি হয়েছে তাতে মানুষ বেশীদিন টিকবে না। ওই মশা মাছিই থাকবে।

চায়ের তলানীটুকু গলায় ঢেলে বিটু আবার খবরের কাগজ খোলে। খেলার পাতা। বাংলা বিহার রঞ্জি ট্রফি ম্যাচের খবর পড়তে থাকে। টিকটিক করে একটা কিছু নড়ে তার ভিতরে। ঝিণ্টু খবর দিয়ে গেছে সোমার পেইন উঠেছে। তার একবার যাওয়াটা বোধহয় দরকার। কাজটা শক্তও নয় কিছু। রিকশায় গেলে তিন চার মিনিট।

বিটু!

মফস্বল শহরের এই এক দোষ। বেশীর ভাগ লোকই চেনা। বিটু ব্যস্ত হয়ে বলে, আরে তুলুদি! আসুন। ময়নাগুড়ি থেকে কবে এলেন?

পরশু। তোর কী খবর? শুনলাম বৌয়ের বাচ্চা হবে!

বিটুকে কথা বলে যেতে হয়। কী বলছে তা সবসময়ে বিটু বুঝতেও পারে না। অর্থহীন সংলাপ সম্পূর্ণ না ভেবে-চিন্তে চালিয়ে যায়। কিন্তু বলে খুব কনফিডেনস নিয়ে। বাকযন্ত্রের এরকম অপব্যবহার বুঝি আর হয় না।

বিটু পরিষ্কার বুঝতে পারে, এই যারা আসে, কথা বলে, জিনিস কেনে তারা কেউ পুরোনো বিটুকে মনে রাখেনি। যে বিটু একসময়ে প্রকাশ পাড়ুকোনের সঙ্গে খেলেছিল, যে বিটুর সিনেমার নায়ক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরা বিটুকে চেনে কেবল দোকানদার বলে।

তুলুদি একখানা ক্রিমের টিউব কিনল। তারপর বলল, কালই চলে যাচ্ছি।

কালই? কেন ক'দিন থেকে যান-না।

না রে। কর্তাকে তো জানিস। আমি ছাড়া চলে না।

বিটু খবরের কাগজটা ফের টেনে নেয়।

কিন্তু পড়তে পারে না। বারবারই টিকটিক করছে কী একটা। সোমা! সোমার পেইন উঠেছে। সেটা বড় কথা নয়। মেয়েদের তো বাচ্চা হয়েই থাকে।

তবে সোমার একটা বুকের দোষ আছে। ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছিল,

বাচ্চা হতে গিয়ে আবার বিপদ ঘটতে পারে। তার কি একবার যাওয়া উচিত?

আজকাল গভীর একটা আলস্য এসেছে বিটুর। শরীরে নয়, মনে। কিছুই যেন তাকে চমকে দেয় না, নড়াতে পারে না। সংসারে যাই ঘটুক তার মনে একটুও বুজকুরি কাটে না কোনো ঘটনা। নিজের এই নির্লিপ্ততা দেখে নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয় বিটু। দু তিন বছর আগেও যে-বিটু এ শহরে দাবড়ে বেড়াত তার সঙ্গে আজ এই বিটুর দেখা হলে কেউ কাউকে চিনতেই পারবে না।

৬

শাশুড়ির অসুখ, একটু দেখতে যাওয়া উচিত। কিন্তু মণ্টু বুঝতে পারে না সে গিয়েই বা কী করবে। মঞ্জরী তাকে বারবার বলে গেছে বটে, অফিসের পরই সোজা গিয়ে মহানন্দার মোড় থেকে মিনিবাস ধরবে। ভুল যেন না হয়। মা তোমাকে দেখতে চেয়েছে।

শাশুড়ির বোধহয় শেষ অবস্থা। কিন্তু তিনি মণ্টুকে দেখতে চান কেন সেটাই প্রশ্ন। ভয় অবশ্য তাঁর একটা আছে। জামাইয়ের বৈরাগ্যব্যাধির কথা তিনি জানেন। যদি জামাই কখনো সংসার ছেড়ে হিমালয়-টিমালয়ে লম্বা দেয় তো তাঁর মেয়েটির কী দশা হবে।

মণ্টু তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি যে, এই বিশাল জীবজগতে হরেক প্রাণের নিত্যি নতুন খেলায় কোথায় একটি প্রাণ নিবে গেল, কোথায় আর একটি জ্বলে উঠল তাতে জগতের ক্ষয়বৃদ্ধি নেই। যে একবার এই জগতের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে সেই জানে ব্যক্তিগত মৃত্যু কোনো ঘটনাই নয়। যেমন নয় বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী নাই বা হলো মণ্টু, যদি আজই অফিস থেকে ফেরার পথে সে অ্যাকসিডেণ্টে মারা যায় তাহলে কি দুনিয়া অচল হয়ে যাবে? নাকি দিন কাটবে না মঞ্জরীর? পৃথিবীতে অপরিহার্য তো কেউ নয়।

উনি অবশ্য এসব খুবই মন দিয়ে শোনেন। আবেগে চোখের জল মুছে বলেন, তুমি বড় জ্ঞানী বাবা, বড় জ্ঞানী। তবে কি জানো, আমরা সংসারী মানুষ, তত্ত্ব দিয়ে সংসারীদের কি বিচার হয়?

মণ্টু টের পায় বৈরাগ্য তো নয়ই বরং সংসার এবং বিষয় তাকে এক মস্ত অজগরের মতো পাকে পাকে জড়াচ্ছে আরো। দেবোনা-দেবোনা করেও অফিসারের পরীক্ষা দিয়েছিল মণ্টু। এক চান্সে হয়ে গেল। মালদা থেকে সটান পাঠিয়ে দিল শিলিগুড়ি। মণ্টুর ইচ্ছে ছিল, সংসার থেকে একটু দূরে থাকে। বিশেষ করে মঞ্জরীর কাছ থেকে। স্ত্রী-সঙ্গকে সে পাপ মনে করে না বটে, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে থাকা মানেই ধ্যান থেকে দূরে নিক্ষেপ হওয়া। ভ্যানর ভ্যানর ভ্যাজর ভ্যাজর নানা তুচ্ছাতি-তুচ্ছ অভিযোগ অনুযোগ নালিশ ও পরনিন্দা শুনতে শুনতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় সে। অবিরল তার ভেতরে এক রক্তক্ষরণ হতে থাকে। শিলি-গুড়িতে বদলী না হলে খুব ভালো হতো। সে চেয়েছিল সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের বদলে এই বদলীর চাকরি একরকম ভালো। সে নিজে রেঁধে খেত। একলা ঘরে বসে নিত্য পূজা পাঠ করে কাটিয়ে দিতে পারত। শিলিগুড়িতে আসতে হলো বোধহয় কর্মফল কাটাতে।

বেলা সাড়ে দশটা বাজতে চলল। এখনো অফিসে হাজিরায় বিস্তর ফাঁক। অধিকাংশ কাউন্টার এবং টেবিলেই লোক নেই। আমানত-কারীদের সংখ্যা বাড়ছে। অধৈর্যের নানা শব্দ আসছে।

মণ্টু একটু চিন্তিতভাবে চারদিকে তাকায়। ভারী অস্বস্তি বোধ করে। ধর্মের মধ্যে নানা কথা থাকে। সবই প্র্যাকটিক্যাল কথা। একটা হলো, যথাসময়ে যথাবিহিত কর্তব্যটি কোরো। মণ্টু এক মিনিটও দেরীতে অফিসে আসে না। ডিসিপ্লিন কথাটার মূলে আছে ডিসাইপেল কথাটা। শিষ্যত্ব। আগের দিনে গুরুগৃহে শিষ্যত্ব নিয়ে বহু কষ্টে শিখতে হতো আত্ম-শাসন। এখন কে কাকে শেখায় আর কেই বা শেখে?

মণ্টুর পাশের টেবিলে টেলিফোন। বার সাতেক বাজার পর করচৌধুরী টেলিফোনটা তুলল। অনেক আগেই তুলতে পারত। বসে বসে খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল।

গাঙ্গুলী, আপনার ফোন।

মণ্টু হাত বাড়িয়েই ফোনটা নাগালে পায়। শাশুড়ির কিছু হয়ে গেল নাকি?

মিত্র নার্সিং হোম থেকে বলছি। আপনার মা কথা বলবেন।

মা! কী হয়েছে মার?

সুমনার ঘাবড়ানো গলা পাওয়া গেল, মেজো বউমাকে ভর্তি করে দিলাম।

কেন, পেইন উঠেছে নাকি?

হ্যাঁ, কিন্তু হার্টটাও বোধহয় ভালো না। ডাক্তার ই সি জি করাতে নিয়ে গেছে। একজন হার্ট স্পেশালিস্টকে খবর দেওয়া হয়েছে। একবার আসতে পারবি?

পারব। ঘণ্টাখানেক পরে গেলে হবে তো?

তা হবে। বিটুকে খবর দিয়ে দিয়ে আনতে পারিনি। পারলে তাকেও নিয়ে আসিস।

ঠিক আছে।

আমি তাহলে বাড়ি চলে যাই।

যাবে? যাও না।

তোর বাবাকে ভাতটুকুও বেড়ে দিয়ে আসতে পারিনি। জনার্দন কী দিতে কী দেয়, ছেলেমানুষ।

হ্যাঁ হ্যাঁ চলে যাও। তোমার ওখানে আর কাজই বা কী?

তুই কিন্তু আসিস বাবা। ডাক্তারের কাছে অবস্থাটা একটু বুঝে যাস।

মণ্টু ফোন রেখে দিল। মনটা একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল তার। সোমা মেয়েটিকে বড় স্নেহ করে সে। বড় দুঃখী মেয়ে। দুঃখীদের মুখে ভগবানের ছাপ থাকে। একথা ঠিক যে দুঃখ ব্যাপারটা মানুষ পছন্দ করে না। ধর্মের উদ্দেশ্যই হলো দুঃখকে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু এমন কিছু দুঃখ আছে যা আনন্দের চেয়েও গভীর। যে দুঃখের ভিতর দিয়ে ভগবান ধরা দেন তা কি পরিত্যাগযোগ্য?

মণ্টু সংসার-উদাসীন বটে, কিন্তু সোমা আর বিটুর সম্পর্কটা সে টের

পায়। বিটুটা, একদম অন্যরকম হয়ে গেছে, আজকাল। দোকান ছাড়া আর কোনো দিকেই মন নেই। বউটার প্রতি তার কোনোদিনই কোনো মনোযোগ নেই। অথচ মেয়েটা বিয়ের আগেও এক দুঃখের জীবন যাপন করে এসেছে। বিয়ের পরও তাই। কী যে হবে! এত অনাদরেই বুঝি মেয়েটার শরীর সারে না। ওই অনাদরই বুঝি জন্ম দিয়েছে দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগের।

এক একদিন সে সোমাকে উপনিষদ বোঝায় বা গীতা শোনায় এবং ব্যাখ্যা করে। মেয়েটা ভাশুরকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে বটে কিন্তু এইসব ধর্মগ্রন্থ পাঠে তেমন আগ্রহ বোধ করে না। কেমন শক্ত হয়ে জোর করে বসে থাকে মাত্র।

ভাইয়ের বউ হলেও সোমাকে মা বলেই ডাকে মন্টু। বেশীর ভাগ মহিলাকেই সে মাতৃ সম্বোধন করে। মা ডাকের মতো আর ডাক নেই। যে ডাকে তারও শুদ্ধি হয়, যে শোনে তারও শুদ্ধি হয়। একদিন সে সোমাকে বলল, মাগো, তোমার কি ধর্মে বিশ্বাস নেই?

সোমা অনেকক্ষণ চুপ করে গোঁজ হ'য় বসে থেকে বলল, ঠিক বুঝতে পারি না।

কেন মা? কোন্‌টা শক্ত?

সবটাই ভীষণ শক্ত মনে হয়।

মন্টু মৃদু মৃদু মাথা নেড়ে বলে, ধর্মের মতো সহজ স্বাভাবিক আর কিছুই নয়। এ তো বাক্সে তুলে রাখার জিনিস না, এ নিত্য চর্চার ব্যাপার। যদি ধর্মকে জীবনের সব আচার আচরণের মধ্যে অনুবাদই না করা গেল তবে ধর্ম দিয়ে মানুষের কোনো লাভ নেই। ধর্ম একটা ফলিত জিনিস, একটা হওয়ার ব্যাপার। শুধু শুনলে শক্ত তো লাগবেই। কিন্তু যদি করে দেখ, যদি চর্চা করো তাহলে দেখবে শ্বাস চলার মতো স্বাভাবিক।

সোমা তর্ক করেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করেছিল শুধু।

মেয়েটা তর্ক জানে না, ঝগড়া জানে না, কুচুটেপানা নেই, এক অবোধ

ভীরু চাউনি আছে শুধু। মেয়েটাকে কেন যে বিটু অত অবহেলা করে! বিটু আর মঞ্জরীকে নিয়ে যে গুজবটা আছে তা সবই জানে মন্টু। যূথীর কাছে শুনেছে, মায়ের কাছেও খানিকটা। বাকিটা আন্দাজ করে নিতে তার কষ্ট হয়নি। কিন্তু মন্টু এমন এক মানসিক অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছে যেখানে ঈর্ষার জ্বলুনি নেই, রাগ নেই, দখলদারী নেই। সে ঘটনাটি শুনেই ওদের ক্ষমা করেছে। সে জানে কৃতকর্মের জন্য মানুষের অনুশোচনা না এলে বাইরের গঞ্জনা দিয়ে কর্মফল কাটে না।

মন্টু হাফ-ডে ছুটি চেয়ে একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে উঠে পড়ল। গিয়ে ঢুকল এজেন্ট কর্মকার সাহেবের ঘরে।

ছুটি! হঠাৎ ছুটি কেন গাঙ্গুলী?

একটু দরকার আছে। বাড়ির লোকের অসুখ। কার? আপনার ওয়া-ইফের?

না, ভাইয়ের স্ত্রীর।

ভাই মানে বিটু তো? তার বউ তো আমাদের সোমা! তার আবার হলো কী?

বাচ্চা হবে। হার্টটাও ভালো না।

আপনি জানেন না সোমাকে আমি এইটুকু থেকে দেখেছি। আমিও চা-বাগানের ছেলে তো। ওর মামা আর আমি বানারহাট স্কুলে পড়তাম। ওর মামা অবশ্য আমার চেয়ে বছর কয়েকের সিনিয়র।

তাই নাকি! বলেননি তো কখনো।

আপনি তো মশাই সদ্য বদলী হয়ে এলেন। আপনার পর আমি এসে জয়েন করেছি। বলার সুযোগ হয়নি বলে বলিনি। সোমার হার্টের অসুখ ছিল জানতাম না তো! অবশ্য হতেই পারে। যা অত্যাচার ওর ওপর করত।

মন্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। সোমার সঙ্গে যখন বিটুর সম্বন্ধ হচ্ছিল তখনকার একটি ঘটনা মন্টুর খুব মনে পড়ে। একদিন বিকেলের দিকে

সোমার মামা এসেছেন বিয়ের কথাবার্তা বলতে। হঠাৎ জামার বোতাম খুলে পৈতেগাছ বের করে হাতে জড়িয়ে নিয়ে জোড়হাত করে কেঁদে ফেলে বলে উঠলো, আমার ভাগ্নীটাকে সংসারের নির্যাতন থেকে উদ্ধার করুন। এর বেশী আর কিছু বলার নেই আমার।

বড় কষ্ট হয়েছিল মন্টুর। নিজের স্ত্রীর কথা ভদ্রলোক ভেঙে বলেননি। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ওই ইংগিতই যথেষ্ট।

কর্মকার জরুরী কাজ সারতে সারতে বললেন, বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

মন্টু বসল।

কর্মকার কাগজপত্র সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, আপনি তো ধার্মিক মানুষ ব'লে সবাই বলে। আমার ছেলের কুষ্ঠিটা একদিন একটু বিচার করে দেবেন?

মন্টুর হাসি পেল। ধর্ম আর জ্যোতিষকে অনেকেই এক করে দেখে। অনেকে আবার ভাবে ধর্ম মানেই অলৌকিক ঘটনাবলী। এই অজ্ঞতার বুঝি শেষ নেই। সে বলল, আমি জ্যোতিষচর্চা করিনি তো কখনো!

সে কী মশাই? জ্যোতিষ না জানলে ধর্ম করেন কিসের?

মন্টু একটু হাসল, ধর্ম আর কীই বা করি বলুন তবে জ্যোতিষের সঙ্গে ধর্মের তেমন কোনো যোগাযোগ আছে বলে জানিনা ও একটা আলাদা শাস্ত্র, খানিকটা বিজ্ঞান, খানিকটা অনুমান। অদৃষ্ট মানে যা দৃষ্ট নয়, যা অগোচর। আমার তো মনে হয় সৎ কাজ করে গেলে তার ফল পাওয়া যায়ই। সৎকর্মীর কখনো অমঙ্গল হয় না। একদিন আগে আর পাছে।

কুষ্ঠি বলে কিছু বিশ্বাস করেন না?

করি। তবে প্রাচীন শাস্ত্রে যে কটা গ্রহের উল্লেখ আছে তা ছাড়াও আরো গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে পরে। সুতরাং জ্যোতিষ শাস্ত্র পূর্ণাঙ্গ নয়।

যাঃ, আপনি যে একেবারে জল ঢেলে দিলেন মশাই। আমি ভাবছিলাম একদিন আপনাকে নিয়ে জমিয়ে বসব কুষ্ঠি-ফুষ্ঠি পেতে।

না, আমি ওসব তেমন জানি না।

ঠিক আছে। তাহলে একদিন ধর্ম আলোচনাই শোনান আমাদের। আমার বাড়িতে। আমার স্ত্রী আবার ভীষণ সন্তোষী মা'র ভক্ত।

আজকাল অনেকেই।

হুজুগ, না?

তা একরকম বলা যায়।

শুক্রবারে তো মশাই উপোসটুপোস করে সে এক পেল্লায় কাণ্ড বাধিয়ে বসে।

মণ্টু বিনীতভাবে একটু হাসল।

কর্মকার মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি চলে যান। সোমা কি নার্সিং হোম-এ আছে?

বিকেলের দিকে একবার যাব'খন।

৭

ড্রেনের ওপর বাঁশের চ্যাটাইয়ের সাঁকোটা ঝিণ্টুর খুব অদ্ভুত লাগে। একটু উঁচু রাস্তা থেকে এবড়ো খেবড়ো জমি নেমে গেছে। তারপরই মস্ত ড্রেন। তার ওপর সাঁকো। যখন নতুন ছিল তখন একরকম। এখন জরাজীর্ণ। বাঁধন খুলে গেছে, বাচ্চা ছেলেরা বাঁখারি টেনে বের করে নিয়ে খেলা করেছে, সাঁকোটার ওপর এখন বিপজ্জনক গর্ত। সাইকেলে পার হওয়া খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু ঝিণ্টুকে সেকথা কে বোঝাবে ? সে ওই উঁচু রাস্তা থেকে সাইকেল গড়িয়ে প্রচণ্ড স্পীডে নেমে আসে। ধুলো উড়িয়ে, মচাক মচাক শব্দ তুলে সাঁকোটা পার হয় প্রায়ই।

পর্ণা রাগ করে, খুব বাহাদুরি, না ! একদিন যখন উল্টে পড়বে তখন তো প্রেস্টিজ পাংচারড।

সকলেরই যেমন থাকে তেমনি ঝিণ্টুরও একজন আছে। পর্ণা। খুব ডাঁটিয়াল মেয়ে। কাউকে পাত্তা দিত না এতকাল। ঝিণ্টুর সঙ্গেই প্রথম। তবে ডাঁটিয়াল হলেও পর্ণারা গরিব। বেশ গরিব। শহরের একটু বাইরে গরিবদের পাড়ায় সরে এসে বাড়ি করতে হয়েছে ওর বাবাকে। বাড়িটাও তেমন দেখনসই নয়। পাকা ঘর, টিনের চাল। পর্ণার বাবা যে কী করে তা বলা মুস্কিল। সোজা কথায় বলা যায় ধান্দাবাজ। যেখানেই কোনো কাজ কারবার হচ্ছে সেখানেই গিয়ে ঢুঁ মারা ভদ্রলোকের স্বভাব। এই ধান্দাতেই সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তার মধ্যেই দেখা যায় জ্যোতিষ-চর্চা করছেন, হোমিওপ্যাথি করছেন, বাড়ির দালালি করছেন।

পর্ণা ঝিন্টুর চেয়ে নীচুতে পড়ে। মুখখানায় শ্রী আছে। চোখ দুখানা ভারী মায়াবী। ঝিন্টুর বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল ওকে। আজও লাগে। তা বলে যে পর্ণার সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধতে হবে এমন নয়। ঝিন্টুর একটু আপত্তি আছে পর্ণার বাবাকে নিয়ে। ফোর টুয়েন্টি শ্বশুর তার পছন্দ নয়। তার ওপর পর্ণারা কায়স্থ। অন্য জাতের বউ বাড়িতে নিয়ে তুললে তুলকালাম হবে। তাই ঝিন্টু ওসব ভাবে না। ভাববার দরকারও নেই। তার বিয়ের এখনো ঢের দেরী।

পর্ণাদের বারান্দায় পা ঠেকিয়ে সাইকেল দাঁড় করিয়ে ঘন ঘন দুবার ঘন্টি দিল ঝিন্টু। পর্ণা আজ কলেজ যাবে না, কথা ছিল।

পর্দা সরিয়েই পর্ণা বলল, এই মাংস খাবে ?

কিসের মাংস ?

আহা ! কিসের আবার, খাসীর। আমি রাঁধছি।

ওরে বাবা। তুমি রাঁধছো তার মানে খাসীটার মরেও সুখ নেই।

ইয়ার্কি কোরো না। বোসো, আসছি।

ঝিন্টু ঘরে ঢুকে চারদিকে রোজকার মতো চেয়ে দেখল। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না বলে একটা উদ্ভট প্রবাদ আছে। প্রবাদটার অবশ্য কোনো মানে হয় না। ঝিন্টুর তো মনে হয় প্রচুর শাক দিয়ে এক টুকরো মাছ অনায়াসেই ঢাকা যায়। ড্যাম ইজি। তবু পর্ণাদের এই ঘরে ঢুকলে তার প্রবাদটা মনে পড়বেই। কারণ এই ঘরে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার একটা প্রাণান্তকর প্রয়াস তার চোখে পড়ে। দেয়াল থেকে বেশী বালি মেশানো পলকা পলেস্তারা খসে যাচ্ছে, চৌকাঠের কাঠ ফাটছে, জানালা দরজার রঙ চটে যাচ্ছে, তবু বাঁধানো এমব্রয়ডারি ঝোলে দেয়ালে, লেস লাগানো ঢাকনায় ঢাকা হয় সস্তার টেবিল, নড়বড়ে চৌকির বিছানায় বেশ ঝকঝকে বেডকভার পাতা। এলেবেলে একটা কাঁচ বসানো আলমারিতে গুচ্ছের মাটির পুতুল। এসবই ঝিন্টু একটু বাঁকা চোখে এবং সকৌতুকে লক্ষ্য করে। গরিবদের ঘরে দেখা যায় পর্দাটা বাহারী হবেই। পর্ণাদেরও তাই।

ভারী উজ্জ্বল সব উদ্ভট ফুল ছাপা পর্দা ঝুলছে।

পর্ণা নয়, ঘরে ঢুকলেন ওর ফোর টুয়েন্টি বাবা। হাতে ঘটিভরা জল, পরনে ভেজা গামছা, চোখে ধান্দাবাজের চাউনি।

এই যে, বোসো বোসো। পর্ণা বোধহয় রান্নাঘরে।

দেখা হয়েছে!

হয়েছে? বাঃ।

ভদ্রলোক ঘটিটা ঘরের কোণে রাখলেন। কাঁধ থেকে নিংড়ানো ধুতিটা চট করে বারান্দার তারে মেলে দিয়ে একটা লুঙ্গি গলিয়ে ফের ঘরে ঢুকে গিঁট মারতে মারতে বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে সেদিন সারদা ক্লথ হাউসে দেখা। তুমি নাকি ওয়ার্ল্ড টুরে যাচ্ছো!

ইচ্ছে আছে।

বেশ বেশ। সাইকেলে গেলে বোধহয় পাসপোর্ট লাগে না, না?

লাগে।

পৃথিবীটা খুব বড়। বিশাল। যাও, দেখে এসো। আমাদের লাইফে অ্যাড-ভেঞ্চার বলে তো কিছু নেই। ওনলি টু পাইস। আচ্ছা, বিটুর বউয়ের নাকি হার্টের কিসব ট্রাবল শুনছিলাম!

হ্যাঁ।

এদিকে তো আবার প্রেগন্যান্সি। বড় মুস্কিল। ভেরী ডেলিকেট কেস। আমি একটা ওষুধ রেখেছি বেছে। নিয়ে যাবে নাকি? প্রসবের ব্যথা উঠলেই দিতে হবে।

উঠেছে।

উঠেছে? সর্বনাশ! কবে?

আজ সকালে। এতক্ষণে বোধহয় নার্সিং হোম-এ নিয়েও গেছে।

ইস্ পালসেটিলা থার্টিটা সকালেই পড়া উচিত ছিল। একেবারে পাকা আমের আঁটির মতো প্রসব হয়ে যেত। নার্সিং হোম-এ কি হোমিওপ্যাথি চলবে?

ঝিণ্টু জানে লোকটা ধূর্ত। সবাই জানে। বউদির জন্য মা, নিশ্চয়ই ওর কাছে ওষুধ চায়নি। কিন্তু ধান্দাবাজটা নিজেই একটা যোগসূত্র খুঁজছে। কাছে ঘেঁষতে চাইছে। এরকম শ্বশুর হলে ঝিণ্টুকে আত্মহত্যা করতে হবে।

ঝিণ্টু পা নাচিয়ে বলল, হোমিওপ্যাথি একটা বোগাস জিনিস।

লোকটা চটল না। দেয়ালের গায়ে লটকানো কাঠের ফ্রেমের মধ্যে তেড়াবেঁকা আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নির্বিকার মুখে বলল, হোমিওপ্যাথি হলো পরমাণু তত্ত্ব। তোমরা অ্যাটমিক এজ-এর ছেলে হয়ে পরমাণুর শক্তি মানো না?

পরমাণুর সঙ্গে হোমিওপ্যাথির কোনো মিল নেই। পরমাণু একটা এনার্জি আর হোমিওপ্যাথি একটা ধাপ্পাবাজী।

পর্ণার বাবা যে চটবেন না তা ঝিণ্টু জানে। এইসব ধান্দাবাজরা সহজে চটে না। চটলে এদের চলে না। তাছাড়া চটবেই বা কেন, এর তো কোনো আদর্শবোধ নেই, ব্যক্তিত্ব নেই।

পর্ণার বাবা হাতের মাদুলিটা সেট করে নিয়ে বলল, অনেকেই বলে বটে, তারা জানে না। জিনিসটা জানলেই তবে বোঝা যায়—

এই ঝিণ্টু, চলে যাওনি তো—বলতে বলতে পর্ণা ঘরে ঢুকল। বাবাকে দেখেও বিশেষ গ্রাহ্য করল না। হাতে একটা ছোটো প্লেট। তাতে ধোঁয়া-ওঠা অনেকটা মাংস।

ঝিণ্টুর ভারী কষ্ট হলো দেখে। অত মাংস সে এমনিতেই খাবে না। কিন্তু অতটা যে নিয়ে এসেছে তাও চক্ষুলজ্জাবশে। মাংসের কেজি এখন বাইশ বা চব্বিশ টাকার কম নয়। সম্ভবত পর্ণাদের বাড়িতে পাঁচশো গ্রামের বেশী আসেনি; ওদের ফ্যামিলি মেম্বার তো কম নয়। তবু সেই টান টান পরিমাণ থেকে যতটা পারে তুলে এনেছে শুধু গরিব বলে প্রমাণিত না হওয়ার জন্যই।

ঝিণ্টু মাথা নেড়ে বলল, মাংস খেয়েই কাল রাত থেকে পেট আপসেট।

দেখলেই গা শিরশির করে। নিয়ে যাও সামনে থেকে।

পর্ণা ফ্যাকাশে হয়ে বলে, খাবে না? এ মা!

কী বললাম তাহলে? খাওয়ার উপায় নেই। তবে গন্ধটা দারুণ ছেড়েছে। রিমার্কেবল। ঘ্রাণেই অর্ধভোজন হয়ে গেল।

ইস্ দেখ তো!

ফোর টুয়েন্টিটা আর দাঁড়াল না। চট্ করে ভিতরবাড়িতে সেঁধিয়ে গেল।

পর্ণা বলল, তাহলে রেখে আসি?

প্লীজ রেখে এসো।

কত কষ্ট করে করলাম! খেলে না।

আহা, যদি তেমন কপাল হয় তবে তোমার রান্নাই তো হোল লাইফ খেতে হবে।

কী আমার সুখের কথা রে। হোল লাইফ ওঁর জন্য রাঁধতে হবে! ইঃ বয়ে গেছে।

আর আমাকে যে সে রান্না কষ্ট করে খেতেও হবে সেটাও কি কম কথা?

পর্ণা মাংস রেখে আসতে গেল। একটু বাদে আঁচলে মুখের তেলঘাম মুছতে মুছতে ঘরে এসে বলল, বিটুদার বউয়ের নাকি পেন উঠেছে? বাবা বলছিল।

তোমার বাবাটা পর্ণা, মাইরি একটা ফোর টুয়েন্টি।

অ্যাই! ভ্যাট ওসব বলতে নেই।

আমাকে হোমিওপ্যাথি বোঝাচ্ছিল।

তা বোঝাক না শুনে গেলেই তো হয়। কম-জানা হোমিওপ্যাথরা একটু বেশী বকবক করেই।

ঝিন্টু হেসে ফেলল। বলল, তা বটে।

তোমার মেজো বউদির চোখ দুখানা কিন্তু ফ্যান্টা।

বউদিটা খুব আনহ্যাপী।

শুনেছি। বিটুদা নাকি একটু নেগলেকট করে।

এ শহরে কারো কোনো সিক্রেট থাকেনা কেন বলো তো ! সবাই সকলের ঘরের কথা জানে।

সোমা বউদির কথা তুমিই বলেছো আমাকে মশাই।

কবে ?

একদিন সাইকেলের রডে আমাকে বসিয়ে আনছিলে তিলক ময়দানে ফাংশনের পর। রিক্সা পাওয়া যায়নি সেদিন। মনে আছে ?

ওঃ, মে বি।

তখন তোমার রডওলা সাইকেলটা ছিল। পুরোনোটা।

একটু মাথা নাড়ল ঝিন্টু। চোখের সামনে ঝক করে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য। মহারাষ্ট্রের এক অখ্যাত অজ্ঞাত জায়গায় রাস্তার ধারে আগাছার জঙ্গলে সাইকেলটা আজও কি পড়ে আছে ? জং ধরছে তাতে ? মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ধীরে ধীরে ?

মনটা ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হয়ে গেল। ঝিন্টু উঠে বলল. চলি পর্ণা।

কোথায় যাচ্ছো এখনই ?

যাই একটু শহরটা টহল দিই গে।

এত টহল দাও কেন বলো তো ! সাইকেল যে তোমার শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেল। দু চোখে দেখতে পারি না তোমার সাইকেল।

ওয়ার্ল্ড ট্যুর করে ফিরে এলে যখন খবরের কাগজে নাম বেরোবে তখন বুঝবে সাইকেলের মহিমা।

সাইকেল আমার সতীন।

হাসতে হাসতে ঝিন্টু উঠল।

বাইরে তো ঘরের অবরোধ নেই। অবারিত পৃথিবী। উত্তরে ওই দেখা যায় পৃথিবীর উত্তুঙ্গ ঢেউ। হিমালয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝকঝক করে জ্বলছে রোদে। পাহাড় মিন্টুকে ডাকে। তাকে ডাক পাঠায় সমুদ্র। জঙ্গল। মাঠ। প্রান্তর। দেশ ও বিদেশ। সাইকেল তাকে ডেকে নিয়ে যাবে দূর দূরান্তে। একদিন খুব বেশী বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগেই সে নাগপুরের

কাছে সেই জায়গাটায় যাবে। খুঁজবে। বহু খুঁজতে হবে তাকে। তবু খুঁজে দেখবে তার পুরোনো সাইকেলখানা তখনো সেখানে পড়ে আছে কিনা।

দুঃসাহস ছাড়া কেউ এভাবে বাঁশের চ্যাটাইয়ের সাঁকো দ্বিতীয়বার প্রবল গতিতে পার হয় না তারপর এক দুরূহ অসম্ভব চড়াই ভেঙে খানাখন্দ পার হয়ে উঠে আসবে রাস্তায়। ঝিণ্টুকে শিলিগুড়ির লোকেরা যে সাইকেল জাগলার বলে তা এমনিতে নয়। রোজ এইভাবেই সাইকেলে এই পথটুকু নামে এবং ওঠে ঝিণ্টু। লোকে অবাক মানে। কিন্তু তারা দেখেনি, ঝিণ্টু কলেজের পাঁচ সাতটা সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় উঠে যেতে পারে সাইকেলে। এক দেড় ঘণ্টা অনায়াসে সাইকেল স্থির রেখে বসে থাকতে পারে সিটে। গোলপোষ্টের ক্রসবারের ওপর সাইকেল চালিয়ে লোককে তাক লাগিয়েছে ঝিণ্টু। চালিয়েছে তারের ওপর। সাইকেল তার অঙ্গীভূত স্বাভাবিক, সহজাত। পৃথিবীতে সাইকেল আবিষ্কার না হলে ঝিণ্টু বোধহয় জন্মগ্রহণই করত না।

পিছনের চাকায় একটু হাওয়া কম আছে। কাঞ্চার দোকানে হাওয়া ভরে নিল সে।

পাম্প করতে করতেই সে রিক্সায় আর একজন ফোর টুয়েন্টিকে যেতে দেখল। ধর্ম-গেঁড়ে, ধান্দাবাজ, পুরুষত্বহীন। লোকটা তার বড়দা মণ্টু। ছেলেবেলা থেকেই ঝিণ্টু শুনে আসছে তার বড়দার মধ্যে নাকি বৈরাগ্যের লক্ষণ প্রকট, একদিন লোকটা নাকি সাধু হয়ে যাবে। আজও হয়নি, আজও হবো হবো করছে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, ভালো চাকরি, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, শরীরে সুখের মেদ। তবু লোকটা নাকি হাফ-সাধু হাফ-গেরস্থ। খুবই হাসি পায় ঝিণ্টুর। মাঝে মাঝে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, ঈশ্বর আছেন জলে, আছেন অগ্নিতে, আছেন প্রতি পরমাণুতে …ইত্যাদি। এ আর এক হোমিওপ্যাথি। আছেন তো বুঝলাম বাবা, কিন্তু মালটিকে বের করে দেখাও চাঁদু। গদগদ স্বরে গলা কাঁপিয়ে

কাঁপিয়ে 'আছেন' বললেই তো হবে না।

ধর্ম-বাতিকের জন্য লোকটার বোধহয় সেক্স ফোর্সও কমে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। আর সেইজন্য বড় বউদি একসময়ে তিতিবিরক্ত হয়েই জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ধরে পড়েছিল মেজদা বিটুকে। কেলেংকারিয়াস কাণ্ড আর কাকে বলে। শহরে টি টি। সেই ছিঃছিক্কারেও এই ধর্মের ষাঁড়ের চৈতন্য হলো না। দিব্যি নির্বিকার ঠাণ্ডা মেরে নানা বাতিক করে যাচ্ছে।

আজকাল ধরেছে সেজ বউদি সোমাকে। আহা, সোমার বড় দুঃখ। সোমা বড হতভাগিনী। সোমা বড় একা। তাই সোমা-উদ্ধার করতে বেদ বেদান্ত গীতার কচকচি ঝেড়ে যাচ্ছে। ঝিন্টুর পাপী মন। তার সন্দেহ হয়, লোকটার মধ্যে অবরুদ্ধ সেক্স একটা নির্গমনের পথ খুঁজছে। সোজা পথে বেরোতে পারছে না। অতএব বাঁকা পথ। সোজা কথায় বিকৃতি। বোধহয় সোমার সাহচর্যে লোকটার মানসিক ভাবে যৌন-তৃপ্তি হয়। এরকম হতেই পারে।

রিক্সাটা ঘ্যাচ করে থামল।

এই, এই ঝিন্টু।

ঝিন্টু সাইকেল ঝড়াকসে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, কী বড়দা?

কোথায় যাচ্ছিস?

সাইকেলে হাওয়া দিচ্ছিলাম।

বউমার খবর শুনেছিস তো।

শুনেছি।

অবস্থা খুব ভালো নয়।

কেমন অবস্থা?

অপারেশন মানে সিজারিয়ান করা দরকার। কিন্তু হার্টের কণ্ডিশন ভীষণ খারাপ।

ঝিন্টু একটু ভাববার ভান করে বলল, তা আমাদের কী করার আছে?

করার নেই ?

ঝিণ্টু বাধো বাধো গলায় বলে, মানে বলছিলাম, আমরা তো লে ম্যান, মেডিক্যাল ম্যানরা যা করার তা তো করবেই। খামাখো আমাদের ব্যস্ত হওয়ার দরকার কী ?

বড়দা একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর বলল, বিটুকে খবর দিয়েছিলি ?

দিয়েছি।

এল না কেন ?

কিছু বলল না তো।

আমি নার্সিং হোম-এ যাচ্ছি। তুই বিটুকে ধরে নিয়ে আয়।

ঝিণ্টু এ ব্যাপারটা একদম বোঝে না। কারো অসুখ হলে আত্মীয়রা অকারণ অস্থির হতে থাকে। কিন্তু বোঝে না যে, তারা ডাক্তার না হলে অসুখের ব্যাপারটা তাদের হাতে নেই। অনেক সময় ডাক্তার হলেও নেই। মেডিকেল সায়েন্সও সীমাবদ্ধ জিনিস। তবু নিজেরা উদ্বিগ্ন হবে এবং সবাইকে খুঁচিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। বউদি নার্সিং হোম-এ আছে, চিকিৎসাও হচ্ছে। তবু একে ডাক, ওকে ডাক। বিরক্তিকর।

সাইকেলে উঠে ঝিণ্টু বলল, যাচ্ছি।

দোকানটার নাম লাভ স্টোর কে রেখেছিল যেন। তার বাবাই। হ্যাঁ, যৌবনে যখন কলকাতায় ল' পড়তেন তখন তাঁর এক গরিব বন্ধু লাভ স্টোর নামে এক দোকান খুলে ধাঁ করে বড়লোক হয়ে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি থেকেই নামটা রাখা। ইংরিজিতে সাইনবোর্ড, সুতরাং লোক ভাবে লাভ মানে প্রেম। আসলে তো জানে না ওই লাভ-এর ধ্বনি-সাদৃশ্যের বাংলা শব্দটির মানে হলো নাফা বা মুনাফা। তার মধ্যে কোনো রোমান্টিক ব্যঞ্জনা নেই। এল ও ভিই নয়, নিতান্তই ল-এ আকার আরম্ভ।

৮

ক্রিং ক্রিং করে ঘন্টি বাজছে। ঝিন্টু।

মেজদা, বউদি নার্সিং হোম-এ। এখনো যাওনি যে!

বিটু ঝিন্টুর দিকে তাকাল। বলল, গিয়ে কী হবে?

ঝিন্টু বিরক্ত মুখে বলে, বড়দা তোমাকে বলতে বলল যে, বউদির অবস্থা খারাপ। তোমার একবার যাওয়া দরকার।

খারাপ? কিরকম খারাপ?

খুব খারাপ, হার্ট ট্রাবল হচ্ছে।

বিটু হাতের খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রেখে বলল, সেদিনই তো ই সি জি করানো হয়েছে। নরম্যাল। আজ আবার কী হলো?

জানি না। আমি যাচ্ছি। তুমি চলে এসো।

দাঁড়া দাঁড়া। দোকান ফেলে এখনই যাওয়ার উপায় নেই। দুপুরে যখন বাড়িতে খেতে যাবো তখন নার্সিং হোম হয়ে যাবো। আর যদি তেমন বুঝিস তবে সাইকেলে করে এসে খবর দিয়ে যাস। বুঝলি?

ঝিন্টু সাইকেলটা রেখে নেমে এসে বলল, দোকান আমি দেখছি। তুমি গিয়ে ঘুরে এসো।

পারবি?

এ আবার না পারার কী? সুখময় আর প্রবীর তো আছেই।

প্রবীর নেই! তাকে মাল আনতে পাঠিয়েছি। সুখময়টা নভিস।

তবু আমি পারব। তুমি যাও।

বিটু বুঝল, কেস জটিল। ভ্যাবলার মতো বোধবুদ্ধিহীন চোখে কিছুক্ষণ ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, মরে ফরে যায় নি তো অলরেডি?

আরে না। তাহলে আমি এত নরম্যাল থাকতাম নাকি?

পিণ্টু কোথায়?

সকালে বোধহয় বউদিকে বাসে তুলে দিতে গিয়েছিল। তারপর এখনো ফেরেনি।

বিটু উঠে বলল, তাহলে বোস। আমি তোর সাইকেলটা নিয়ে যাচ্ছি।

সাবধানে চালিয়ে যেও।

কেন সাবধান হওয়ার কি আছে?

এটা তো তুমি চালাও নি কখনো। গিয়ার সিস্টেম। টপ করে স্পিড উঠে যায়। তার ওপর যা রাস্তা।

তুই পারলে আমিও পারব। একটু ঝাঁঝের গলায় কথাটা বলে বিটু বেরিয়ে এল। সেদিনকার ছোকরা সব বিটুকে সাইকেল চেনাচ্ছে। ঝিণ্টুর বয়সে বিটুও কিছু কম সাইকেলবাজ ছিল না। শুকনা থেকে একবার সাইকেলে পাহাড়ে অবধি অনেকখানি উঠে গিয়েছিল। সত্য বটে আজকাল সে আর সাইকেল চালায় না। তার স্কুটার আছে। তবে সেটা কয়েকদিন হলো খারাপ হয়ে গ্যারেজে পড়ে আছে।

বিটু সাইকেলে উঠেই বুঝল, ঝিণ্টু কিছু বাজে কথা বলেনি। সাইকেলটায় আচমকাই স্পীড ওঠে। ঝিণ্টু রাখে যত্নে। নিয়মিত তেল-টেল দেয়, ঝাড়ে মোছে। এই-ই ওর স্বভাব। যা কিছু ওর আছে সব জিনিসের প্রতিই ওর প্রগাঢ় যত্ন। পারতপক্ষে নিজের জিনিসে ও কাউকে হাত দিতে দেয় না। বিটুকে যে সাইকেলটা দিল তার কারণ হলো বিটু তার স্কুটার ওকে প্রায়ই চড়তে দেয়।

নিউ মার্কেট অবধি ভাড়েও বেশ চলে এল বিটু। মোড় ঘুরবার সময় ঘ্যাচাং করে পেছনের চাকাটা একটা রিক্সার সঙ্গে বেঁধে গেল। বিটু পা ঠেকিয়ে পতন আটকাল বটে, কিন্তু লক্ষ্য করতে দেরী হলো না যে পিছনের

চাকার একটা স্পোক বেঁকে গেছে। দামী সাইকেল।

রিক্সাওলাটা বেকুবের মতো চেয়েছিল। বিটু এবং তার ভাইদের বোধহয় খানিকটা চেনে।

সাইকেল থেকে নেমে রাগে অন্ধ বিটু চটাং করে চড় কষাল বেকুবটার গালে।

বাপ রে! বলে লোকটা মুখটা চেপে ধরল দু হাতে।

বিটু বাঁ হাতে চুলের মুঠিটা ধরে আরো দু চারটে রদ্দা কষাতেই লোক জমে যেতে লাগল চারদিকে।

শুয়োরের বাচ্চা! গাঁজা খেয়ে রিকসা চালাস?

মারটা একটু বেশি হয়ে গেল বুঝি। বিটু চুলটা ছাড়তেই লোকটা মাটিতে বসে পড়ল, তারপর হিক্কা তোলার মতো একটা অদ্ভুত জান্তব শব্দ তুলতে লাগল গলায়।

এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি বিটু, রিকসায় একজন অল্প বয়সী মেয়ে বসে আছে অদ্ভুত সুন্দর চেহারা। মেয়েটার মুখে কেমন ঘাবড়ানো সাদা ভাব। অপলক চোখে দৃশ্যটা দেখেও বাক্যহারা হয়ে, চোখের পলক অবধি ফেলছে না।

লোকজন রিক্সাওলাটাকে টেনে ওঠানোর চেষ্টা করল। একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, কী হয়েছে বিটুদা?

ছ্যাখ না শুয়োরের বাচ্চা ঝিণ্টুর দামী সাইকেলটা বরবাদ করে দিল।

ঝিণ্টুর সাইকেল? ও বাবা। দেখি দেখি, এঃ, স্পোকটা একদম গেছে।

বিটু মেয়েটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেও লজ্জা পেল মনে মনে। একটু চিনতেও পারল। পরশু কি তার আগের দিন লাভ স্টোরে একটা টমেটো কেচাপ আর নুডলস্ কিনতে এসেছিল। শহরে বোধহয় নতুন। আগে দেখেনি।

একটা খদ্দের বোধহয় হাতছাড়া হয়ে গেল তার। যদি অবশ্য মেয়েটা তাকে চিনে থাকে।

বিটু ফের সাইকেলে ওঠার সময়েও লক্ষ্য করল, রিক্সাওয়ালা মাটিতে বসেই আছে। উঠতে পারছে না। হিক্কার মতো শব্দটা হচ্ছে।

কিন্তু বিটু আর অপেক্ষা করল না। সাইকেলে উঠে পড়ল। বাঁকা স্পোক ফ্রেমে ঘষটাচ্ছে। অস্বস্তিকর একটা শব্দ। স্পীড নিচ্ছে না। হ্যাণ্ডেল কাঁপছে। বিটু নামল। সামনেই সুশীলদের বাড়ি। বারান্দায় উঠে হাঁক মারল, বেলা, এই বেলা।

সুশীলের ছোট বোন ছুটে এসে বলে, বিটুদা?

এই সাইকেলটা তোদের বাড়ি রেখে যাচ্ছি। ঝিন্টু এসে পরে নিয়ে যাবে।

আচ্ছা। তুলে রাখব ঘরে।

বিটু রাস্তায় এসে রিক্সা নিল।

এ শহরের রিক্সাওয়ালারা তার হাতে কিছু কম মার খায়নি। বেয়াদবি করলেই চড়টা চাপড়টা অনায়াসে কষিয়েছে। তখন কোনো অনুশোচনা হতো না, মনে কষ্ট হতো না। এখন কিন্তু একটু হলো। অ্যাকসিডেণ্টে দোষ যতটা রিক্সাওয়ালার, ততটা তারও। কিন্তু না মারলে রাগটা যেত না। ঝিন্টুর দামী সাইকেল ও কাউকে ধরতে দেয় না, তাকেও খুব সদিচ্ছার সঙ্গে দেয়নি। তার ওপর সেও যে এক সময়ে একজন দারুন সাইকেলবাজ ছিল তা আর তেমন বিশ্বাসযোগ্য থাকবে না ঝিন্টুর কাছে।

ঝিন্টু সাইকেল ভালই চালায়, বিটু জানে। ঝিন্টু আরো অনেক কিছুই ভালো জানে। ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিল টেনিস। কতটা ভালো তা অবশ্য পরীক্ষা করে দেখেনি বিটু। শুনেছে। এবার নাকি ওয়ার্ল্ড ট্যুরে যাওয়ারও তোড়জোড় করছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে জমা হলো বিটুর।

নার্সিং হোম-এর ফটকেই রোদে দাঁড়িয়ে আছে মন্টু। মুখেচোখে সাঙ্ঘাতিক উদ্বেগের ছাপ।

বিটু রিক্সা থেকে নামতে নামতে বলল, কী রে?

অবস্থা খুব খারাপ।

কতটা খারাপ ?

স্পেশ্যালিস্ট এসে দেখে গেছে। বলেছে চান্স ফিফটি ফিফটি। হা দুর্বল বলে সিজারিয়ানও করা মুশকিল।

বিটু এসব শুনল উদাস মুখে।

মণ্টু বলল, বাবাকে বোধহয় একটা খবর দেওয়া দরকার।

বাবাকে কেন ?

একবার এসে দেখে যেত।

দেখতে কি দেবে ?

কি জানি।

বিটু মাথা নেড়ে বলে, দেবে না। ওকে রেখেছে কোথায় ?

ও টি-তে। অক্সিজেন দিচ্ছে। বিমলকে একটু খবর দিবি ?

বিমল ?

ওই যে কণ্ট্রাক্টর। দারুণ হোমিওপ্যাথ শুনেছি।

এখন এই অবস্থায় হোমিওপ্যাথি ?

হোমিওপ্যাথি সকলে সবার শেষেই করায়। যখন অ্যালোপ্যাথি ফেল করে।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু মিত্র কি অ্যালাউ করবে ?

করবে। আফটার অল ক্ষতি তো নেই।

দেখি।

বিটু আবার একটা রিক্সায় উঠল। রিক্সাওয়ালাটা ঝুঁকে পেডাল মারছে। পিছন থেকে দেখে একটু চমকে উঠল বিটু। এইটে সেই রিকসাওলাই নয় তো, যাকে একটু আগে সে মেরেছে ? ভালো করে দেখার জন্য ঝুঁকে বসল বিটু। তারপর বুঝল, না। এ নয়। এ অনেক বাচ্চা। তবে চেহারায় তেমন বৈশিষ্ট্য থাকে না বলে এদের সকলকেই কেমন যেন একরকম লাগে।

৯

সুমনা কাপড় ছেড়ে সবে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, পিন্টু এল।

কোথায় যে থাকিস।

কী হলো মা?

সোমাকে এই নার্সিং হোম-এ ভর্তি করে দিয়ে এলাম। হার্টের ব্যথা উঠেছে। কী যে হবে! আলায় বালায় কোথায় ঘুরিস বল তো। সেই বড় বউমাকে বাসে তুলে দিতে কোন্ সকালে বেরিয়েছিস, আর এই ফিরলি! যা গিয়ে একটু মুখটা দেখিয়ে আয় নার্সিং হোম-এ। তোকে দেখলে একটু তটস্থ হবে সবাই।

পিন্টু জানে মা ঠিকই বলছে। এখনো সে গিয়ে দাঁড়ালে শিলিগুড়ির লোক তটস্থ হয়। তবে এই প্রভাব কতদিন থাকবে তা বলা কঠিন। এখন যুগ দ্রুত পাল্টায়। পরের জেনারেশনের ঢেউ এসে আগের জেনারেশনের সব চিহ্ন মুছে দেয়। সে যদিও নিতান্তই যুবাপুরুষ, তবু যুবতররাও এসে গেছে। রাজনীতি আজকাল এক মস্ত ক্যারিয়ার। চাকরির চেয়ে বহুগুণে ভালো জিনিস। সুতরাং আজকাল রাজনীতিতে বেজায় ভিড়। দলে দলে এসে জোটে। তীব্র প্রতিযোগিতা। এই বাজারে প্রভাব প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখা শক্ত।

পিন্টু বলল, যাচ্ছি। ছোটো বউদির অবস্থা কি খারাপ নাকি?

কি জানি বাবা, রোগা মেয়ে। বাচ্চা হওয়ার ধকল সইতে পারা কি চাট্টিখানি কথা। তার ওপর হার্টের ব্যামো। বিয়ের আগে ভালো করে

খোঁজখবর করা উচিত ছিল। হুট করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো, এখন পস্তাও।

কথাটা শুনে পিণ্টু খুশি হলো না। একটু ঝাঁঝ দিয়ে বলল, নিজের মেয়ে বলে একটু ভেবে দেখ তো। তাহলেই দেখবে আর দুঃখ থাকবে না। পরের মেয়ের হরেক দোষ।

তোকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না। এখন যা, গিয়ে দেখ কিছু করতে পারিস কিনা?

ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

পিণ্টু বাইরে এসে ফের রিকসা থামাল একটা। একটা বিধ্বস্ত লাশকাটা ঘরের ধ্বংসস্তূপে কংক্রিটের টেবিলটা আজও দাঁড়িয়ে আছে—এই দৃশ্যটা সে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না আজ। ছোটো বউদিটা কি বাঁচবে? চান্স খুব কম। কিন্তু মেয়েটা বড় ভালো ছিল। দেমাক-টেমাক নেই, দেওরদেরও ভাসুরের মতো করে সম্মান-টম্মান করত। আসলে বোধহয় খুব ভীতু। গরিবের ঘরের অনিশ্চয়তা থেকে, নিপীড়ন থেকে হঠাৎ এক সম্পন্ন পরিবারে অধিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রেণীগত দূরত্বটা ঘোচাতে অসুবিধে হচ্ছিল বোধহয়। খুব খাটে মেয়েটা। রোগা শরীর আর দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র নিয়েও প্রাণপাত পরিশ্রম করে। কুয়ো থেকে জল তোলা, কাপড় কাচা, গুল দেওয়া নিজে থেকেই করে যেত। অত কাজ করার দরকার নেই তার। বোধহয় নিজেকে ভুলে থাকার জন্য করে। পিণ্টু ফেরে অনেক রাতে। কোনোদিনই রাত বারোটার আগে খায় না। বরাবর তার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকে। এই বউদিটি সেই নিয়ম ভেঙে প্রতি রাতে তাকে গরম ভাত খাওয়ায়। প্রথম প্রথম তাকে আপনি-আজ্ঞে করত, পিণ্টু ধমক দিয়ে ছাড়িয়েছে। বউদি হলেও বয়সে পিণ্টুর চেয়ে ঢের ছোট। তবু নববর্ষে বা বিজয়ায় বয়সে ছোটো বউদিকে সে প্রকৃত ভক্তিভরে প্রণাম করে।

কে জানে কে, এবাড়িতে পিণ্টুর একটু অনাদর আছে। বিটু যেমন

মায়ের প্রাণ, ঝিন্টু তেমনি বাবার আদুরে। বড়দা মন্টুকেও সকলে খুব সুনজরে দেখে। শুধু পিন্টুই না ঘরকা, না ঘাটকা। একটু উড়নচণ্ডী, বারমুখো, পলিটিক্সবাজ ছেলে বলেই হয়তো। কিংবা কে জানে কী। সংসারের আদরের বড় তোয়াক্কাও করে না পিন্টু। সে চায় জনসাধারণের আদর, সমর্থন এবং ভোট। মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ ইত্যাদি তার কাছে ফালতু হয়ে গেছে কবে থেকে। সংসার হচ্ছে একটা বদ্ধ জলাশয়। তাতে জল পচে, গন্ধ হয়। বাইরের জগৎ হচ্ছে সমুদ্রের মতো বিশাল। পচন নেই, আবদ্ধতা নেই, অবিরল ঢেউ আর ঢেউ।

তবু সংসারে এই একটা মানুষ যে তাকে আদর জানায় সেটাই বা ভোলে কী করে পিন্টু? সে তো অকৃতজ্ঞ নয়।

রিকসা থেকে একটু ঝুঁকে পড়ল পিন্টু, এই দাঁড়া! দাঁড়া! কী হয়েছে রে?

একটা রিকসাকে ঘিরে মেলা ভিড়। পিন্টু নেমে পড়ল।

একটা মুখচেনা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, পিন্টুদা! যাক বাবা, বাঁচা গেল।

কী হয়েছে?

একটা রিকসাওলাকে একটু আগেই বিটুদা কয়েকটা চড়চাপড় দিয়েছিল। ব্যাটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

চড়চাপড় দিলো কেন?

সাইকেলে ধাক্কা দিয়েছিল।

পিন্টু দুহাতে ভিড় সরিয়ে এড়িয়ে যায়। রিকসাওলাটা মাটিতে পড়ে আছে। কেউ জল টল দিয়েছিল মুখে। মাথা মুখ জামা সব ভেজা। ভিড়ের মধ্যে সুন্দরমতো একটা মেয়ে খুব অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

পিন্টু ভিড়টাকে একটা ধমক দিলো, হাঁ করে মজা দেখছেন সবাই। যান যান পাতলা হোন। অ্যাই এদিকে এসে ধর তো, আমায় রিকসায় তুলে দে।

পিন্টুর কাছে এসব জলভাত। পলিটিক্স করে করে তার মনের জড়তা ভেঙে গেছে। শহরে বা যেখানেই যা কিছু ঘটুক সে চট করে যথাকর্তব্য করতে এবং দায়িত্ব নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। রিকসায় লোকটাকে তুলে পিন্টু তাকে জড়িয়ে ধরে বসল।

মেয়েটা এগিয়ে এসে বলল, শুনুন, ওকে আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

কেন বলুন তো ?

আমি ওর রিকসায় ছিলাম। আমি পুলিশে একটা ডায়েরি করতে চাই।

পিন্টু বিনা দ্বিধায় বলল, করবেন। আমি ওকে হসপিটালে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

আপনার নামটা ?

পিন্টু, পিন্টু গাঙ্গুলি।

ভিড়ের ভিতর থেকে দু চারজন বলে উঠল, আরে আরে আমাদের পিন্টুদা, পিন্টুদাকে সবাই চেনে দিদি, ভাববেন না।

পিন্টু বলল, আপনি ?

আমি শচী চক্রবর্তী। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশের লেকচারার। নতুন এসেছি।

পিন্টু একটু হেসে বলল, মনে থাকবে। এই রিকসা, চল।

পুলিশে ডায়েরি করবে। এঃ। পিন্টু, আপনমনেই একটু মুখ ভেঙাল। রিকসাওলাটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর উনি স্টাইল মেরে দাঁড়িয়ে মুখে প্যাথস ফোটাচ্ছেন, এই তো সিমপ্যাথি। সিমপ্যাথি থাকলে আগে পুলিশের কথা না ভেবে চিকিৎসার কথা ভাবতিস।

লোকটা একটু গোঙাল। কেমন করুণ কাতর শব্দ।

পিন্টু লোকটাকে ভালো করে ধরে রইল। ঘাড়টা লটপট করছে। বিটুটা। দিন দিন কী হচ্ছে !

পিন্টু শুনেছে, জাপানে রাস্তায় ঘাটে ছোটখাটো অ্যাকসিডেন্ট হলে

কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়া কাজিয়া করে না। দু পক্ষই গায়ের ধুলো ঝেড়ে পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে যে যার পথে চলে যায়। ভারী সুসভ্য জাত। আর এখানে সকলেই সকলের প্রতি মুখিয়ে আছে। কিছু হলেই খ্যাঁক।

পিন্টু জানে, রিকসাওলাদের ওপর এরকম নির্যাতনের পিছনে কারণটা অর্থনৈতিক। ছোটোলোককে ভদ্রলোকেরা হ্যাটা করবেই। যদি এরা সংগঠিত হতো। শ্রেণীগতভাবে কিছু মর্যাদা পেত তাহলে এরকমটা ঘটতে পারত না। রিকসাওলাদের একটা ইউনিয়ন আছে বটে। কিন্তু রিকসা যেমন কমজোরি যান রিকসাওলাদের ইউনিয়নটাও সেইরকম।

হাসপাতালের দিকে যেতে যেতে পিন্টু সমাজব্যবস্থার হাজারো ফুটো কথা ভাবতে থাকে। কবে যে পলিটিকসে প্রাণ আসবে, কবে যে জেগে উঠবে দেশটা, কবে যে সচেতন হবে মানুষ!

হাসপাতালে রুগী ভর্তি করা পিন্টুর কাছে কোনো সমস্যা নয়। আউট ডোরের ডাক্তার দেখে-টেকে বলল, হেড ইনজুরি বলে মনে হচ্ছে।

কেসটা কি সিরিয়াস?

দেখা যাক্। ভর্তি তো করে নিই। নামধাম জানেন?

না। কেয়ার অফ পিন্টু গাঙ্গুলি করে দিন। জ্ঞান হলে নাম বলবে।

ডাক্তারের ভ্রূকুটিকুটিল মুখখানা অনেকক্ষণ ধরে চোখের সামনে ভাসে পিন্টুর। কী যেন নাম বলল মেয়েটা? শচী চক্রবর্তী। নর্থবেঙ্গল ইউনি ভার্সিটির ইংলিশের লেকচারার। একটু স্পিরিটেড মেয়ে কী? খোঁজ নিতে হবে।

রিকসাওলাটার যদি ভালো-মন্দ কিছু হয় তাহলে রাস্তার লোক কেউ বিটুর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে যাবে না। কিন্তু মেয়েটা গড়বড় করতে পারে। আহাম্মক বিটু বড্ড বেমক্কা মেরে বসেছে কমজোরি আধবুড়ো লোক টাকে।

১০

ব্রহ্মকুমার রায়টা খুব নির্বিকারভাবেই শুনলেন। তাঁর মক্কেল জিতেছে। কিন্তু যাকে এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জেতালেন ব্রহ্মকুমার সে একটি ঘড়েলস্য ঘড়েল। চোতা দলিল আর ব্রহ্মকুমারের গলাবাজির জোরে একটা পুরো সুপুরিবাগান গাপ করে নিল। ওই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আর একগাল ভ্যাটকানো হাসি নিয়ে বসে আছে। তবে কে কীরকম তা আর ভাবেন না ব্রহ্মকুমার। মক্কেলমাত্রই লক্ষ্মী। মক্কেল মানেই সজ্জন।

ব্রহ্মকুমার কাগজপত্র ব্রিফ-কেস-এ ভরলেন। আর একটা শুনানি ছিল আজ। ডেট পিছিয়ে দিয়েছেন। নার্সিং হোম-এ একবার না গেলেই নয়। সংসারে বড্ড ঝামেলা। শুধু মামলা মোকদ্দমা নিয়ে থাকতে পারতেন তো বেশ হতো।

বাইরে আসতেই মক্কেলটা ঢিপ করে প্রণাম করল।

জোর লড়ে দিলেন উকিলবাবু।

ব্রহ্মকুমার জোর করে একটু হাসলেন। লোকটার পিছনে আর একজন চামচা গোছের লোক। তার হাতে মস্ত সন্দেশের বাক্স। মক্কেল বাক্সটা নিয়ে ব্রহ্মকুমারের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, একটু মিষ্টিমুখ করবেন। সুপুরিও দিয়ে যাব'খন কিছু।

দিও।

বাঁধা রিকশাওলা খগেন এগিয়ে এল গাড়ি নিয়ে। ব্রহ্মকুমার উঠলেন।

তাঁর মেজো বউমাটি ভালো না মন্দ সঠিক জানেন না ব্রহ্মকুমার। কথাটথা বিশেষ বলেন নি কখনো। তবে মেয়েটির গলার আওয়াজ কদাচিৎ পাওয়া যায়। যারা চুপচাপ থাকে তাদের একটু সমীহ করেন ব্রহ্মকুমার। তবে তিনি লোকমুখে শুনেছেন, মেয়েটি ভালোই। তাঁর স্ত্রী সুমনা কারোই বিশেষ প্রশংসা করেন না। কিন্তু তিনিও এই মেয়েটি সম্পর্কে খুব বেশী কিছু বলেন না। তিনি আরো শুনেছেন, তাঁর ছেলে বিটুর সঙ্গে বউমার সম্পর্ক ভালো নয়। কিন্তু ব্রহ্মকুমার এর বেশী আর কিছুই তেমন জানেন না। তাঁর ছেলে মেয়ে বউ এরা সব অস্পষ্ট কিছু অবয়ব, আধচেনা কিছু মানুষ মাত্র, সম্পর্কও নিতান্তই ক্ষীণ।

লাভ স্টোরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ব্রহ্মকুমার রিকসা থামিয়ে নামলেন। দোকানটা বেশ ঝকঝকে। প্রচুর জিনিস। কিন্তু কাউন্টারে ঝিন্টু কেন?

ঝিন্টুকে জিজ্ঞেস করার আগেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মেজদা নার্সিং হোম-এ গেছে। আমি দোকান দেখছি।

ও। বলেই ব্রহ্মকুমারের কথা ফুরিয়ে গেল। ছেলের সঙ্গে আর কী কথা বলা যায় তা ভেবেই পেলেন না।

কিছু বলবে বাবা?

না, এই একটু খোঁজ নিয়ে গেলাম। বিক্রিবাটা কেমন?

খুব ভালো।

খদ্দের তো নেই দেখছি।

এ সময়টায় খদ্দের হয় না। সন্ধেবেলা দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না।

তাই নাকি? বাঃ।

আবার রিকসায় এসে বসলেন ব্রহ্মকুমার। কিন্তু খগেনটা কোথায়? এই তো ছিল। বিড়ি টিড়ি খেতে গেল নাকি? চারদিকে তাকিয়ে খগেনকে খুঁজতে লাগলেন ব্রহ্মকুমার। কোথায় যে যায়!

রিকসাটা আপনা থেকেই একটু পিছিয়ে গেল। তারপর থামল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই খগেন এসে সিটে চেপে বসল আবার। টাটকা বিড়ির গন্ধ পেলেন ব্রহ্মকুমার।

হুট করে কোথায় গিয়েছিলি ?

কয়েকজন ডাকল, একটা হাঙ্গামা হয়েছে।

হাঙ্গামা ? কিসের হাঙ্গামা ?

একজন রিকসাওলাকে খুব মেরেছে। হাসপাতালে দিতে হয়েছে। বিকেলে রিকসা স্ট্রাইক হতে পারে।

কে মারল ?

বিটুবাবু।

বিটু ? বলিস কী ?

তাই তো বলছে সবাই।

ব্রহ্মকুমার ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

কেন মেরেছে জানিস।

সাইকেলের সঙ্গে নাকি ধাক্কা লেগেছিল।

ব্রহ্মকুমার বললেন, সাবধানে চালাস। তোরাও বড্ড রেকলেস। এমন চালাস যে মনে হয় তোরা বুঝি ট্রাক ড্রাইভার।

মনে মনে ব্রহ্মকুমার ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন, গর্ভস্রাব। গর্ভস্রাব!

নার্সিং হোম-এ নামতেই তিন ছেলে এগিয়ে এলো।

কী খবর রে ?

মণ্টু বলল, ভালো নয়।

ভালো! ভালো বলে কি কিছু আছে তাঁর জীবনে ? নিজের মনে যে একটু নিজের কাজ নিয়ে থাকবেন, তার উপায় নেই। সংসার খাবলা মারে, নিয়তি এসে চিমটি কাটে, দুর্ভাগ্য আড়ালে হাঃ হাঃ করে হাসতে থাকে।

বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, কাকে বলে মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছিস!

বিটুকে একটু বিবর্ণ দেখায়। মিনমিন করে বলে, ঝিণ্টুর দামী সাইকেলটার বারোটা বাজিয়েছে। তাই দু একটা চড়চাপড় দিয়েছিলাম রেগে গিয়ে।

কী সব শুনছি। স্ট্রাইক-ফাইক হবে নাকি।

পিন্টু বলল, ও নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি জগার সঙ্গে কথা বলেছি।

জগা কে?

রিকসা ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

কী বলল?

রিকসাটার পারমিট ছিল না। রিকসাওলাটাও নতুন। কেউ তেমন চেনে না। ম্যানেজ করা গেছে।

ব্রহ্মকুমার সন্দেশের বাক্সটা নিয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বড় ছেলের দিকে বাক্সটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা রাখ।

এর পরেই তাঁর কথা ফুরিয়ে গেল। কী বলতে হবে বা কিরকম মুখভাব করতে হবে তা বুঝতে পারছেন না। ভ্রূ কুঁচকে একটা দুশ্চিন্তার ভাব ফোটানোর চেষ্টা করলেন। ফুটল কিনা কে জানে।

হঠাৎ জলপাইগুড়ির মক্কেলের কথা মনে পড়ল। পিন্টুর দিকে চেয়ে ছেলেদের বললেন, জলপাইগুড়ির মামলাটায় তোকে অ্যাটেণ্ড করতে বলেছিলাম না!

পিন্টু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, পার্টির একটা মিটিং ছিল।

সেটা আমায় জানাতে কী হয়েছিল?

পিন্টু অধোবদন হলো। কিন্তু ব্রহ্মকুমার আর কিছু বলতে পারলেন না। ছেলেদের তিনি কখনো শাসন করেননি। কী করে বকাবকি করতে হয় সেই প্রসেসটাই জানেন না।

তিন ছেলে ও তাঁর মধ্যে এক অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। অস্বস্তিকর নীরবতা। যেন চারজন আগন্তুক পরস্পর পরিচয়বিহীন দাঁড়িয়ে আছে।

১১

ডাক্তারের কপালে চিনচিনে ঘাম। চোখে উদ্বেগ। দুটি নিপুণ হাত রক্তাক্ত দক্ষ গহ্বর থেকে একটা মানুষের ছানাকে বের করে আনল। একজন নার্স হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল বাচ্চাটাকে ?

হার্ট ?

ও-কে।

পালস ?

ও-কে।

যাক, বেঁচে গেল বউটা। এ যাত্রায় বেঁচে গেল। বিটুকে ডাক্তার সাবধান করে দেবেন, আর যেন বাচ্চা না হয়।

ডাক্তার খুব দ্রুত হাতে সেলাই করতে লাগলেন!

বড়লোকেরা সহজে মরে না। তাদের জন্যই নার্সিং হোম, দামী ওষুধ, ভালো ডাক্তার, ভালো খাদ্যদ্রব্য। গরিবেরা হাসপাতালে যায়। সেখানে অনন্ত ও গভীর এক নরক। ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তার কুকুর ও বেড়াল, পড়ে আছে মেঝেময় মল-মূত্র-বমি, বেড প্যান দেওয়ার লোককে কখনও ডেকে পাওয়া যায় না, ইউরিন্যাল বা বাথরুমে যাওয়ার পথ থৈ থৈ করছে মলমূত্রে, যেখানে প্রতি মুহূর্তে ইনফেকশন ঘটছে, সেখানে এমন সব খাবার দেওয়া হয় যা গরিবেও গলা দিয়ে নামাতে পারে না। দু' একজন ডাক্তার আছে, যারা ওই নরকেও মানুষকে বাঁচিয়ে

তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করে। আছে কয়েকজন নিষ্ঠাবতী নার্স। কিন্তু তারা হাস্যকর রকমের সংখ্যালঘু। ওই অনন্ত ও গভীর নরকে বসে তারা ঈশ্বরকে ডাকে।

ডাক্তার বাসু হাসপাতালের ডাক্তার। তিনি জানেন। আর জানেন বলেই এই শহরে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক চিকিৎসার জায়গা তিনি খুঁজে নিয়েছেন। এই নার্সিং হোম যাঁর তিনিও বাসুর সিনিয়র ডাক্তার। ডাক্তার মিত্রর সঙ্গে বাসুর এই নিয়ে কথা হয়। বাসুর বয়স কম, রক্ত তেজী, অন্যায় অবিচারের নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব তাঁর মধ্যে এখনও প্রবল। মফস্বলের আর এক হাসপাতালে তাঁর কর্ম-জীবনের শুরুতে তিনি ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে লট-কে লট দামী ওষুধ পাচার হয়ে যাওয়ার দুষ্টচক্র ভাঙতে এবং রোগীর পথ্য নিয়ে মামদোবাজী রুখতে তিনি কোমর বেঁধে লাগেন। ফলে তাঁরই অধস্তন কর্মচারীরা দল বেঁধে একদিন চড়াও হলো। অকথ্য গালাগাল, চড়চাপড় আর প্রাণনাশের হুমকি খেয়ে তিনি হতভম্ব। শেষ অবধি কলকাতায় গিয়ে হেলথ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করে সব বলে বিহিত চান। মন্ত্রী করুণ হেসে বলেছিলেন, সবই জানি, করার কিছু নেই। আপনি বরং ট্রান্সফার নিয়ে নিন। চুজ ইওর স্পট।

বাসু সেদিনই বুঝেছিলেন, এদেশে সৎকর্মীরা বড় একা, বড় বেশী সংখ্যা-লঘু এবং নিরাপত্তাহীন। যে দুষ্টচক্র চিকিৎসা জগৎকে ঘিরে বেড়ে উঠছে তাকে ভাঙতে হলে অনেক বড় শক্তিমান কাউকে দরকার। তাঁর মতো লোককে দিয়ে হবে না।

শিলিগুড়িতে বাসুর দু'বছর হয়ে গেল। একটু চড়া মেজাজ, ঠোঁট কাটা এবং দাম্ভিক বলে তাঁর দুর্নাম আছে। আবার অতিশয় দক্ষ এবং নিষ্ঠা-বান শল্যবিদ বলেও খ্যাতি আছে। এ সবই বাসু জানেন। কিন্তু নিজেকে বদলানোর কোনোও প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেন না।

অপারেশনের পর ডাক্তার তাঁর বাক্স খুললেন, রক্তমাখা অ্যাপ্রন ছাড়লেন।

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন অপারেশন থিয়েটারের দরজার মাথায় রামকৃষ্ণ-সারদার যুগ্ম মস্ত ছবির দিকে। তিনি ঠাকুর-দেবতা ধর্মগুরু মানেন না। ডাক্তার মিত্র মানেন। নার্সিং হোমের প্রায় সর্বত্রই ওই দুটি ছবি সাজানো।

রুগীকে কেবিনে নিয়ে যাওয়া হলো। বাসু হাত মুখ ধুয়ে ফিট ফাট হয়ে বেরিয়ে এলেন।

লবিতে বাপ আর তিন ছেলে গাড়লের মতো দাঁড়ানো। দুবছর এ শহরে বাসুর বাস। তিনি এঁদের চেনেন।

প্রথম কথা বললেন ব্রহ্মকুমার, ডাক্তার বোস, মেয়েটা বাঁচবে তো?

বাঁচবে।

বাচ্চাটা?

বেঁচে যাবে। চিন্তা নেই।

ব্রহ্মকুমার একটা মস্ত স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন।

ডাক্তার বাসুর মুডটা যথানিয়মেই খারাপ। রিসেপশনের লগবুকে সই করতে করতে বললেন, কিন্তু একটা কথা। বউটাকে আপনারা ভীষণ নেগলেক্ট করেছেন। ওর হার্ট ট্রাবলটা ক্রনিক। আপনাদের তো টাকার অভাব নেই। ইচ্ছে করলে কলকাতা থেকেও ট্রিটমেণ্ট করিয়ে আনতে পারতেন। তাহলে এত টেনশন হতো না, আমাদেরও জীবন-মৃত্যুর খেলা খেলতে হতো না।

হার্টের অবস্থা যে এত খারাপ তা বুঝতে পারিনি। বিশ্বাস তো দেখছিল। কিছু তেমন বলে নি।

বিশ্বাস? ডাক্তার বিশ্বাসের চেয়ে হাতুড়েও ভালো। যাকগে, সেম প্রফেশনের লোকদের সম্পর্কে নিন্দে করতে নেই। তবে আমি আবার মনে মুখে আলাদা হতে পারি না।

সই করে বিটুর দিকে তাকালেন বাসু। ছেলেটার চেহারায় অতীতের একটা জৌলুস দেখা যায়। এখন কেমন যেন মনমরা। তবে একসময়ে

ব্রাইট ছিল। বাসু তার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো ওর হাজব্যাণ্ড। আপনারই তো দায়িত্ব ছিল ওর প্রপার ট্রিটমেণ্ট করানোর।

বিটু মাথা নোয়াল। জবাব দিলো না।

এনিওয়ে, এবার থেকে নজর রাখবেন। আমি নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার সেনগুপ্তকে খবর দিয়ে রেখেছি। উনি এখানে থাকেন না। সপ্তাহে দুদিন প্লেনে কলকাতা থেকে এসে ক্লাস নিয়ে যান। আজ তাঁর আসার ডেট। উনি বিকেলের দিকে এসে দেখে যাবেন।

হঠাৎ পিণ্টু বলে উঠল, এ শহরে একজন ভালো হার্ট স্পেশালিস্ট নেই, এটা খুব লজ্জার কথা।

ডাক্তার বাসু পিণ্টুর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ খুবই লজ্জার কথা। আপনি আরও লজ্জিত হয়ে পড়বেন যখন শুনবেন যে, মফস্বলের অনেক হাসপাতাল বা হেলথ সেণ্টারে কোয়ালিফায়েড ডাক্তারই নেই। ওষুধ নেই, নার্স নেই, ঝাড়ুদার নেই, কম্পাউণ্ডার নেই।

জানি। আমি মফস্বলে ঘুরি না নাকি?

হ্যাঁ ঘোরেন। কিন্তু পলিটিক্স করতে ঘোরেন।

তাহলে কী করব?

ডাক্তাররা যাতে মফস্বলে কাজ করতে পারে যেমন কণ্ডিশন তৈরি করুন। খুব শক্ত তো নয়। তাদের ওষুধ দিন, এনভিরনমেণ্ট দিন, নিরাপত্তা দিন। দেখবেন সব পাল্টে গেছে। ডাক্তাররা কাজ করতে চায় না এমন তো নয়।

জানি।

আপনারা পয়সার জোরে যে সুবিধেটা পাচ্ছেন তা তো আর সবাই পায় না। নার্সিং হোম বা বেশি ফি দিয়ে ডাক্তার দেখানো এসব অ্যাফোর্ড করতে পারতেন, কিন্তু হাসপাতালটা গিয়ে দেখে আসুন একবার। হার্ট স্পেশ্যালিস্টের কথা বলছেন, একজন ভালো হার্ট স্পেশ্যালিস্টকে এ শহরে আনলেও আপনাদের মতো কিছু পয়সাওলা লোকই তাকে বিজনেস

দিতে পারবেন, গরিবেরা পারবে না।

পিন্টু বাসুর দিকে কটমট করে একটু চেয়ে থেকে বলল, ডাক্তার বাসু, আমি আপনাকে জানি। আপনি গরিবের জন্য করেন, বিনা পয়সায় রুগী দেখেন, খুব ভালো। কিন্তু এ শহরের যে সব ডাক্তার আসে তাদের মধ্যে কয়টা মানুষ বলুন তো। বেশির ভাগই আসে টাকা লুটতে। এ শহরে দুবছর প্র্যাকটিস করলেই লাল হয়ে যায়। ডাক্তার কর, ডাক্তার পাল এরা সব আসলে কষাই। কর দুবার পাবলিকের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়েছে, তবু শিক্ষা হয় নি। প্লীজ, ডাক্তারদের হয়ে ওকালতি করবেন না।

ব্রহ্মকুমার এই বিতর্কটি পছন্দ করছিলেন না। হঠাৎ ছেলের কাঁধে একটা থাবড়া মেরে বললেন, হয়েছে হয়েছে, চুপ করো। যে যত মুখ্যু তার তত লম্বা লম্বা স্পিচ। উনি এই বড় একটা অপারেশন করে বউমাকে বাঁচালেন, আর তুমি ওকে লেকচার দিচ্ছো। যাও এখান থেকে।

পিন্টু একটু থতমত খেয়ে গেল। বাপকে সমীহ করে, তাই আর কথা বাড়াল না। গুটিগুটি "যাচ্ছি" বলে কেটে পড়ল।

ক্লান্ত চোখে ডাক্তার বাসু চেয়ে ছিলেন ব্রহ্মকুমারের দিকে।

ব্রহ্মকুমার অমায়িক হেসে বললেন, ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। পালিটিক্স করে করে মাথাটা গেছে। অতি অপদার্থ। মানী লোককে মান দিতে শেখে নি।

বাসু একটু হাসলেন, পিন্টুবাবুকে আমি জানি।

দোষ আমাদেরই হয়েছে ডাক্তারবাবু। সময়মতো চিকিৎসা করানোর খুব দরকার ছিল। আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন, এ আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে।

ডাক্তার বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, আমি একটু হাসপাতালে যাবো।

তটস্থ ব্রহ্মকুমার বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা।

বাসুর প্র্যাকটিস খুবই ভালো। দিনে দুটো তিনটে অপারেশন থাকে বিভিন্ন নার্সিং হোম-এ। নিজস্ব চেম্বারে রুগীর অভাব নেই। এই শহরে বাসু

হলেন সার্জেনদের রাজা। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে একটা প্রচার আছে যে, তিনি নির্লোভ, টাকাপয়সার খাঁই নেই। উপরন্তু বাসু ব্যাচেলর। সেই-জন্য যারা টাকা দিতে পারে তারাও কাঁচুমাচু মুখ করে গরিব সাজে। সুতরাং বাসুর টাকা তেমন হয় না। ফলে তাঁর সমকক্ষ ডাক্তাররা গাড়ি-বাড়ি করে ফেললেও তাঁর কিছুই হয় নি। এমনকি একটা স্কুটার কিনতেও তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছে। এক মাড়োয়ারী খদ্দের স্কুটারটা মাগনা দিতে চেয়েছিল। উপহার। বাসু নেন নি। পরে অনেক ঝোলাঝুলি করে সেই মাড়োয়ারী স্কুটারটা নামমাত্র দামে গছিয়ে ছাড়ল।

বাসুর মতো অন্যমনস্ক লোকের যে স্কুটার জাতীয় বিপজ্জনক যান চালানো উচিত নয় তা তিনি নিজেও জানেন। কিন্তু এই শহরে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা দিনের মধ্যে পঁচিশ বার দিনে ও রাতে টানা মারা তো সহজ কথা নয়। প্রথম প্রথম হাঁটতেন। পরে রিকসার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু মন্থর রিক্সা তাঁর পেশার পক্ষে উপযুক্ত বাহন নয়। স্কুটার সেদিক দিয়ে খুবই উপযোগী। কিন্তু বাসু সারাক্ষণ নানা চিন্তায় এমন আচ্ছন্ন থাকেন যে, স্কুটার চালাতে তাঁর নিজেরও একটু ভয়-ভয় করে। কিন্তু উপায়ই বা কী?

যতক্ষণ স্কুটারটা চলে এবং তার উপর বাসু সওয়ার থাকেন ততক্ষণ তাঁর একটা টেনশন হয়। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে সমস্ত শরীর ও মন সজাগ ও পথ-অভিমুখী রেখে তিনি ছোটোখাটো দূরত্ব পার হন। এবং যাত্রাশেষে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। সেই কারণেই স্কুটারটার সঙ্গে আজও তাঁর সঠিক বনিবনা হয় নি।

হাসপাতালের চত্বরে স্কুটার থামতেই আবার নতুন টেনশন। এক দঙ্গল রিকসাওয়ালা এসে ঘিরে ফেলল।

ডাক্তারবাবু মাহিন্দরকে মেরে লাট করে দিয়েছে।

না বাঁচালে বহুৎ ঝঞ্ঝাট হয়ে যাবে বাবু।

আমরা বদলা নেবো। বিটুবাবুর খুব তেল হয়েছে।

লাভ স্টোর জালিয়ে দেবো।

বাসু খুব ক্লান্ত বোধ করেন। কিছু একটা হয়েছে। রোজই হয়। স্কুটারটা স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করিয়ে সমবেত ক্রুদ্ধ রিকসাওয়ালাদের দিকে চেয়ে ঠাণ্ডা গলাতে শুধু বললেন, আমি দেখছি। তোমরা শান্ত হয়ে বোসো।

ওয়ার্ডে যেতেই মিত্রা নার্স বলল, এমারজেনসিতে একটা কেস আছে স্যার। মনে হয় সার্জিক্যাল কেস।

রিকসাওয়ালা কি ?

হ্যাঁ। ওই যে বাইরে সব জড়ো হয়েছে। এতক্ষণ চেঁচামেচি করছিল।

কিরকম দেখলেন ?

হেমারেজ হচ্ছে। কোমা।

দেখছি। আর কোনোও কেস ?

একটা স্নেক বাইট আছে। আর একটা বোন ফ্র্যাকচার। সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে বার্ন. কেসটার সেকেণ্ডারি ইনফেকশন দেখা দিয়েছে।

কোয়াইট একসপেকটেড।

বাসু এমারজেন্সিতে এসে দেখলেন লোকটাকে মেঝেয় কম্বলের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। জ্ঞান নেই। গোঙানোর একটা শব্দ হচ্ছে। কষে রক্ত।

বাসু হাঁটু গেড়ে বসে নাড়ী দেখলেন। তারপর বুকে স্টেথো বসিয়ে এবং নানারকম নাড়াচাড়া করে অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর উঠে দাঁড়ালেন। ঝটকা মার সহ্য করতে পারে নি লোকটা। অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, অনির্ণীত নানারকম রোগ, দুশ্চিন্তা শরীরটাকে অনেক আগে থেকেই খেয়ে রেখেছে। এসব লোক বেঁচে থাকে মাত্র পঁচিশ পারসেন্ট। অস্তিত্বে শতকরা পঁচাত্তর ভাগই মরা। বাসু প্রতিদিন শয়ে শয়ে পঁচাত্তর ভাগ মরা মানুষকে দেখতে পান, রিকসা টানছে, মোট বইছে, ভিক্ষে করছে, বেকার বসে আছে। শরীরে স্বাস্থ্য নেই, চোখে দীপ্তি নেই, মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল নয়।

এ লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা বাসু কেন করবেন ? বাঁচাতে হলে অনেক মেহনত যাবে। প্রথম কথা, এর রক্ত দরকার। প্রচুর রক্ত। ব্রেন ড্যামেজ যদি হয়ে থাকে তবে চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে হবে অবজারভেশনে। ইনটে-নসিভ কেয়ার বলে এখানে কিছু নেই, কিংবা যা আছে তাকে ইনটেনসিভ কেয়ারের ক্যারিক্যাচার বলা যায়। সামান্য একজন রিকসাওয়ালার জন্য এতটা কেন করতে যাবেন বাসু ? আরও কোটি কোটি ভারতবাসীর মতো এরও মৃত্যু ঘটে যাক অর্থহীন ভাবে। এ মরলে কার কতটা ক্ষতি ?

হঠাৎ বাসুর মনে পড়ল, রিকসাওয়ালারা পিন্টুর কথা বলছিল। বিটু একে মেরেছে। একটু আগে বিটুর বউকে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন বাসু। আর বিটুর হাতেই মার খেয়ে এ বেচারা ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে।

না, তাহলে লোকটাকে এভাবে মরতে দেওয়া যায় না। বড়লোকেরা টাকা আর প্রভাবের জোরে বাঁচে। গরিবেরা মরে এ দুইয়ের অভাবে। বাসু তাদের মরা ঠেকাতে পারল না। কিন্তু বিটুর হাতে মার-খাওয়া লোকটাকে না বাঁচালে একটা অপরাধ থেকে যাবে।

বাসু নার্সকে ডেকে একটা বেড-এর ব্যবস্থা করতে বললেন।

১২

নামের সঙ্গে মণ্টুদের পদবা এমন জুড়ে গেছে যে আর ছাড়াতে পারে না গৌর কণ্ট্রাক্টর। চেষ্টাও করে না। পৈতৃক পদবী বিশ্বাস। পার্সীদের পদবী ছিল না, পেশা অনুযায়ী যেমন তেমন পদবী নিয়েছিল তারা। তাই কণ্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, সোডাওয়াটার বটল ওপেনারওয়ালা ইত্যাকার নানা বিচিত্র পদবীতে তারা ভূষিত। গৌরবেরও তাই হয়ে যায়। কণ্ট্রাক্টরি করলেও গৌর একসময়ে মধ্যপ্রদেশের এম এল এ ছিল। রাজ্যসভায় যাওয়ার কথা হয়েছিল একবার। গৌর দুবার অল ইণ্ডিয়া মোটর র‍্যালি জিতেছিল। গৌর তারও আগে পাহাড়ে উঠত। বেশ দুরূহ কয়েকটা শৃঙ্গ সে জয় করেছে। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, প্লে বয়, বুদ্ধিমান ও প্রায় অবিশ্বাস্য সাহসের অধিকারী গৌর অবশেষে ঠিকাদারীতে থামবে এটা কেউ আশা করে নি। শিলিগুড়িতে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল। অনেকগুলো ভাইবোন। অভাবের সংসার থেকে গৌর একদিন উধাও হলো। তার সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী আছে। মধ্যপ্রদেশে সে সোনার খনি বা গুপ্তধন পেয়েছে, বোম্বাইতে একটা ঘোড়দৌড়ে কয়েক লাখ টাকা পিটেছে উদ্বাস্তু রিলিফের টাকা মেরেছে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য গৌর এসব কিছুই করেনি। মধ্যপ্রদেশ জায়গাটা সে বেছে নিয়েছিল নিজের চারণভূমি হিসেবে। এই রাজ্যে লোক কম প্রচুর অনাবাদী জমি ও গহীন জঙ্গল আজও আছে। এ রাজ্যের অধিবাসীরা অধিকাংশই বহিরাগত। গৌর এ রাজ্যে এসে কয়েকজন প্রবাসী ও প্রভাবশালী বাঙালীর আনু-

কূল্য পেয়ে যায়। প্রতিভাবানদের খুব সামান্য সাহায্য হলেই চলে। গৌরেরও চললো। মোট দশ বারো বছর মধ্যপ্রদেশে ছিল সে। তার মধ্যেই ওই এম এল এ হওয়া অবধি ছিল। এর থেকেই তার এলেম অনুমান করা যায়।

শিলিগুড়িতে সুমনাদের বাস ছিল গৌরদের বাড়ির কাছেই। এ দুজনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই। সুমনাও জানতেন, গৌরও জানত। কিন্তু বাউণ্ডুলে গৌর ফিরলই না সময়মতো। সুমনার বিয়ে হয়ে গেল ব্রহ্মকুমারের সঙ্গে।

গৌর ফিরল যখন সুমনার কোল ভরে দুটি বাচ্চা এসে গেছে। ফিরেই গৌর ঝাঁপিয়ে পড়ল শিলিগুড়ির ভাণ্ডার লুটতে। মাত্র দু তিন বছরে নিজস্ব বুদ্ধি ও ভুজবলে গৌর এমন উঁচু থাকের ঠিকাদার হয়ে বসল যে, মাড়োয়ারি বেনেরা পর্যন্ত অবাক। আজ গৌরের চার পাঁচ খানা গাড়ি দশ খানেক লরি, চারখানা পেল্লায় বাড়ি, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি এবং দীঘায় হোটেল, হিল কার্ট রোডে মস্ত মোটর পার্টসের দোকান, নিউ মার্কেটে টি ভি এবং ইলেকট্রনিকসের শোরুম, আরও নাকি করবে কী সব। বিয়ে করেনি। টাকা রোজগারই একমাত্র নেশা।

এমনিতে গৌর অতিশয় সজ্জন মানুষ।

সুমনার বিয়ের তিন বছর বাদে গৌর একদিন দেখা করতে এল। সুমনা লজ্জায় সামনে যাননি প্রথমে। ব্রহ্মকুমার বড্ড বেশি ব্যাকুল হয়ে ডাকাডাকি করতে গেলেন।

এমানুষটা তাঁর স্বামী হতে পারত, একথা ভাবাও যে এখন পাপ!

গৌর বেশ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ সুমনার দিকে চেয়ে ছিল। তারপর বলল, বেশ হয়েছো তো! একদম অন্যরকম।

সুমনা লজ্জা পেয়ে পালাচ্ছিলেন।

গৌর বলল, লজ্জা পেয়ো না, এখন লজ্জা পাওয়ার মানে হয় না।

সুমনার অনেক কথা বলার ছিল। খুব বকতে ইচ্ছে করছিল লোকটাকে,

কটা জীবন এই যে অন্যের বউ হয়ে কাটাতে হচ্ছে তাঁকে এটা তো কটা অপমানই।

ের বিরলে গৌর একদিন সুমনার কাছে এসেছিল।

তু সুমনার ডাক নাম। সেই নাম ধরে ডেকে বলল, দোষ আমারই। ন্তু আর কটা দিন ধৈর্য্য ধরলে পারতে।

ী হতো তাতে? তুমি মধ্যপ্রদেশের অত কাজ ছেড়ে আমাকে বিয়ে রতে আসতে?

াসতাম। বিয়ের জন্যই তৈরি হচ্ছিলাম। হঠাৎ বাড়ির চিঠি গেল তোমার ায়ে ঠিক হয়ে গেছে।

থন কী করলে?

ী আর করব। জীবনের অর্থ টাই হারিয়ে গেল। আর বিয়ে করারও ানো মানে হয় না। কাউকে তো আর বউ বলে নেওয়া যাবে না।

মনা খুব কাঁদলেন এ কথায়।

ৌর চলে যাওয়ার আগে বলল, শিলিগুড়িতে ফিরে এলাম তোমার ন্যেই, তোমাকে পেলাম না ঠিকই, তবে কাছাকাছি থাকারও সুখ আছে। াকো। কোথাও চলে যেও না পাগলা সাহেব।

াবো না।

িন্তুই বিয়ে করব না?

া। বলেছি না, বিয়ে করা অর্থহীন হবে। এরও তো একটা রচনা াছে।

গৌর যে বিয়ে করল না এটা সুমনার এক মস্ত জয়। বলতে গেলে তাঁর কমাত্র জয়। গৌর যে খুব আসে বা তাঁদের মধ্যে যে গোপনে অনেক থা হয়, তা কিন্তু মোটেই নয়। গৌর ব্যস্ত মানুষ, হিল্লি-দিল্লি করতে য়। তবে আড়াল থেকে এই পরিবারটিকে গৌর ঠিকানা দিয়েছে অনেক। হ্মকুমারের যখন প্রসার ছিল না তখন গৌরই তাঁকে প্রতিষ্ঠা পেতে বচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। গৌরই করে দিয়েছে ব্রহ্মকুমারের

বাড়িখানা। গৌর আরও কত কী করছে তার হিসেব নেই। সুমনা।
কোনাও প্রয়োজনেই আজ নিঃসঙ্কোচে গৌরের কাছে হাত পাতেন
একটি অধিকারবোধ কাজ করে। মাঝে মাঝে তিনি জিব কেটে ভাবে
আমার কি দুটো স্বামী ?

গৌর সেরকম ভাবে না। তার মনটা অন্য রকম। প্রেমার্ত সে কোনোদিন
নয়। আসলে সুমনার প্রতি তার এক নিরঙ্কুশ অধিকারবোধ ছিল
শরৎচন্দ্রের নভেলে এরকম অনেক দেখা যায়। সেই বাল্য-প্রণয়
ব্যাপারটা সুগন্ধের শূন্য শিশিতে কেমন করে যেন একটু লেগে থাকে

বিটুর বাচ্চা হয়েছে, এখবরটা গৌর পেল তার মোটর পার্টসের দোকা
বসে। নার্সিং হোম থেকে ফোন করেছিল পিন্টু।

গোরাকা, তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি।

গৌর খুবই ব্যস্ত ছিল। সামনেই এক মিলিটারি অফিসার বসা। বি
নেস টক হচ্ছে। একটু সতর্ক গলায় বলল, খারাপ কিছু নয় তো!

আরে না। মেজবৌদির একটা বাচ্চা হয়েছে।

ও। সোমা কেমন আছে ?

ভালো।

ওর না সেই হার্টের কী একটা গণ্ডগোল ছিল।

হ্যাঁ। ডাক্তার বাসু সেফলি ব্যাপারটা ট্যাকল করেছেন।

কোনো কমপ্লিকেশন নেই তো ?

না।

এই পিন্টুকে পুষ্যি নিতে চেয়েছিল গৌর। সুমনা দেন নি। তিনি
হেসে বলেছিলেন, পুষ্যি আবার ঘটা করে নেবে কেন। পাঁচ জনে পাঁচ
কথা বলবে তাহলে। তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল
তা তো কিছু লোক জানে। তার চেয়ে নিজের ছেলে বলে ধরে নাও,
ওর যাতে ভালো হয় দেখ, সেইটেই ভালো।

গৌর যুক্তিটা বুঝেছিল। পুষ্যি নেওয়াটা কাজের কথা নয়। পিন্টুকে

সই থেকে গৌর আলাদা রকমের প্রশ্রয় দেয়। শখের জিনিস কিনে দওয়া, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, সাইকেল বা স্কুটারে বা গাড়িতে চাপানো ।সব পিণ্টুর ছেলেবেলায় গৌর অনেক করেছে। রোজ একবার ছেলে-াকে না দেখে থাকতে পারত না। পিণ্টু একটু বড় হওয়ার পর তার ়ল কলেজের মাইনে বইখাতা জামাকাপড় এবং হাতখরচ সবই ছিল গীরের দায়িত্ব। রাজনীতিতে পিণ্টুর তালিমও গৌরের কাছে। গৌরের ।ঙ্গে পিণ্টুর সম্পর্ক পরস্পরের অজান্তেই বাপ-ব্যাটায় দাঁড়িয়ে গেছে। ।াজও গৌরকেই যা একটু পোঁছে পিণ্টু।

গীর পিণ্টুর মুখখানা একটু ভাবল। বুকটি ভরে গেল মায়ায়। গলাটা ঝড়ে নিয়ে বলল, ভালো খবর। বিকেলের দিকে একবার নার্সিং হোম-এ যতে পারি।

াব শোন গৌরকা। একটা বিপদ হয়েছে।

ী বিপদ ?

বট্টু আজ একটা রিক্সাওলাকে খুব মেরেছে। লোকটা এখন হাসপাতালে। াচতে পারে, নাও পারে। মনে হচ্ছে লোকটা মরে গেলে একটা জোর াঙ্গামা হবে।

গীর একটু বিরক্ত হয়ে বলে, তোরা কি হাত ফাত না চালিয়ে থাকতে ।ারিস না। ভদ্রতা সৌজন্য মায়াদয়ার পাট যে তুলে দিলি!

াহা, আমাকে বকছো কেন ? আমি আর এখন ওসব করি ?

নজে হাতে না করলেও তোর দল করে। যাকগে, কী হয়েছে পরিষ্কার ়রে বল। পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছে ?

। কেস পুলিশের খাতায় উঠবেই। তবে এখনো এনকোয়ারি হয়নি। ়লে মুস্কিল।

া আমাকে কী করতে হবে ?

াামি তার কী বলব ? যা ভালো বুঝবে করবে।

াামি এসব ভালো বুঝি না। তুই বরং একবার থানায় যা। দেখ ডায়েরি

হয়েছে কিনা। এক্ষুণি যা।

হলে কী করব?

আমাকে ফোন করিস। রিক্সা ইউনিয়ন থেকে এসেছিল?

না। তবে রিক্সাওলা মেলা জড়ো হয়েছে হাসপাতালে, শুনলাম।

হবেই। এখন যা বলছি করগে যা।

আর একটা কথা। শচী চক্রবর্তী নামে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির এ লেকচারার আছে। চেনো?

না। চেনবার মতো নাকি?

সে একটু জল ঘোলা করতে পারে। তেজী মেয়ে।

গৌর একটু শঙ্কিত গলায় বলে, কেন, তুই কি তার সঙ্গে তর্কাতর্কি কি করেছিস নাকি?

না। মেয়েদের সঙ্গে আমি কখনও ঝগড়া-টগড়া করি না। সেকেণ্ড গ্রে সিটিজেনদের সঙ্গে কেউ তর্ক করে জাত খোওয়ায়?

গৌর একটু হাসল। তারপর বলল, মেয়েটা দেখতে কেমন?

খুব চোখা।

বয়স?

বেশি নয়। ছুকরি।

সে কি ওই রিক্সায় ছিল?

হ্যাঁ। সেটাই তো শুনলাম।

বিটু হঠাৎ রুস্তম সাজতে গেল কেন? তোদের ভাইদের রক্ত আর ধা এত গরম কেন বল তো! গরিব একটা রিক্সাওয়ালার ওপর এইসব কর কোনোও মানে হয়?

সেইটেই তো কথা গোরাকা। মানুষ যে কেন এত রি-অ্যাক্ট ক বুঝি না। বিটুকে তো জানো, টোটালি ফ্রাস্ট্রেটেড। ও যে কখন কী কর তার ঠিক নেই। এমনিতে তো ঠাণ্ডা, শান্ত, ভদ্র।

গৌর গম্ভীর গলায় বলল, জানি। বিটুকে একবার আমার সাথে দে

করতে বলিস। আর লাভ স্টোর এক বেলার জন্য বন্ধ করে দিতে বল। আজ যেন আর না খোলে।

কেন বলো তো!

পাবলিকের হাতের নাগালে থাকার দরকার কী?

এ কথায় পিণ্টু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হেসে বলল, আরে গোরাকা, তুমি মারধরের ভয় পাচ্ছো নাকি? ও সব হবে না। হলেও থোড়াই পরোয়া করি। পাবলিক এখনও আমাদের সমঝে চলে। আর বিটু মারদাঙ্গা কিছু কম করেনি।

করেছে বলেই ভয়। অনেকের রাগ পোষা আছে।

১৩

শচী শিলিগুড়িতে নতুন। শহরটা সে ভালো চেনেও না। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস শহর থেকে অনেক দূরে, সেই রামমোহন রায়-পুরে। সেখানেই তার কোয়ার্টার, মাঝে মধ্যে বাস ধরে চলে আসে কেনাকাটা করতে। শহর মাত্রই ভালো লাগে শচীর। লোকজন, দোকান পসার, জমজমে ভাব। রামমোহনপুরে বড্ড একটেরে একঘেয়ে লাগে। পড়াশুনো ছাড়া দ্বিতীয় কোনোও অবসর বিনোদন নেই। মাত্রই মাস চারেক হলো সে এসেছে, এখনও তেমন চেনাজানাও হয় নি সকলের সঙ্গে।

একা থাকতে তার কোনোও অসুবিধে হয় কিনা তা জিজ্ঞেস করেছিলেন এক বয়স্ক কলিগ।

শচী বলেছিল, হয়, একঘেয়ে লাগে।

উনি বললেন, সে কথা বলছি না, একঘেয়ে তো লাগবেই, আমি বলছিলাম, আপনি যুবতী মেয়ে, একা, বিপদের আশঙ্কা করে না?

শচী একটু হেসেছিল। এরা তো আর অতীতটা জানে না। শচী চক্রবর্তী ভয় পাবে কি, শচীই তো মানুষের ভয়ের কারণ ছিল একদা। যখন সে সক্রিয় রাজনীতি করত এবং ছিল মোটামুটি সাহসী, মুখর ও প্রবল অনুভূতিশীল। থানা ঘেরাও করা বা পুলিশের উদ্যত বন্দুকের সামনে এগিয়ে যাওয়া কোনোও ব্যাপার ছিল না তার কাছে। দুবার সে গ্রেফতার হয়েছিল। তার মধ্যে একবার তাকে দেড়মাসের মতো জেল খাটতে হয়েছে।

এসব খুব বেশি দিনের কথাও নয়।

তবে বছর খানেক হলো, শচী অনেকটা জুড়িয়ে গেছে। ঘোর বামপন্থী শচী ভূত-ভগবান-ভাগ্য মানে না। প্রচণ্ড আত্মনির্ভরশীল এবং আত্ম-বিশ্বাসী। লতানে স্বভাব তার একেবারেই নেই। বাঙালী ছেলেদের সম্পর্কে সে এতই উন্নাসিক যে, আজ অবধি কোনোও বাঙালী ছেলের প্রেমে পড়ার কথা সে ভাবতেও পারেনি। বিয়ে ব্যাপারটাকে এখনও অবধি সে প্রচণ্ড ঘেন্না পায়।

শচী রাজনীতিতে যেমন উগ্রপন্থী ছিল, ব্যক্তিগত রুচি এবং মেজাজেও তেমনি উগ্রপন্থী। তার সঙ্গে যে-ই একটু মিশেছে সে-ই বুঝেছে যে এটি একটি ঠাণ্ডা বোমা। সাবধানে না চললে যে-কোনোও সময়ে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

আজ রিক্সা-সাইকেল সংঘর্ষের পর যে কুৎসিত ব্যাপারটা ঘটে গেল তা শচীর জীবনে একেবারে নতুন ঘটনা। এরকম পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। সে হকচকিয়ে গিয়েছিল বলে বিটু আজ বেঁচে গেছে। কিন্তু দরিদ্র রোগা বুড়ো রিক্সাওয়ালার ওপর ওই মারের দৃশ্যটা শচীর মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।

মারকুট্টা ছেলেটার নাম জেনে নিয়েছে শচী। যে-ছেলেটা রিক্সাওয়ালাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেছে তার নামও। শচী ছাড়বে না।

আর একটা রিক্সা ধরে সে সোজা থানায় চলে এল।

সর্বত্রই শচী নিজেকে জাহির করতে পারে। তার চোখ, ধারাল মুখ, মুখে কাঠিন্যের রেখা, দৃপ্ত ভঙ্গি এসবের মধ্যেই তার অন্তর্নিহিত সেই উগ্রতা প্রকাশ পায় যাকে কেউ সহজে উপেক্ষা করতে পারে না। ভাঁড়ের মধ্যেও তাকে আলাদা করে চিনে নেয় লোকে। মাতাল, বদমাশ, পাড়ার মস্তান বা রকবাজেরা সহজে তাকে ঘাঁটায় না। তাকে কখনও বিরক্ত করেনি তার সহপাঠীরা।

থানায় সে ঢোকামাত্র খাতির পেল। একজন সুদর্শন সেকেণ্ড অফিসার

তাকে বসাল, পরিচয় জানল এবং কেসটা লিখে নিল।

শচী জিজ্ঞেস করে, আপনারা বিটুকে কখন অ্যারেস্ট করবেন?

এনকোয়্যারির পর।

এনকোয়্যারি কখন হবে?

সেকেণ্ড অফিসার ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি। জীপটা একটু বেরিয়েছে। ওটা ফিরলেই।

আমি শুনেছি বিটুবাবুর বাবা বেশ প্রভাবশালী উকিল এবং পরিবারটাও বোধহয় টাকাপয়সাওলা। কিন্তু আমার অনুরোধ এগুলো যেন আপনাদের ইনফ্লুয়েন্স না করে।

সেকেণ্ড অফিসার একটু হাসল। বলল, আমরা সরকারী চাকরি করি। আমাদের ওপর হাজার রকমের প্রেসার। এসব তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তবু বলছি, আমরা যথাসাধ্য করব। বিটু আর পিণ্টুকে আমি চিনি। পিণ্টু তো প্রায়ই থানায় আসে।

শচী একটু চিন্তিতভাবে বলল, এখানে একটা ডেইলি পেপার আছে না?

আছে।

খবরটা আমি তাদেরও জানাতে চাই।

ঠিক আছে। তবে আপনি না জানালেও জেনে যাবে। থানা থেকেই ওরা খবর নেয় রোজ।

শচী উঠল। রিক্সা অপেক্ষা করছিল তার জন্য। রিক্সাওয়ালা একটি ছোকরা। সে জানে যে, শচী তাদেরই একজন সহকর্মীর জন্য লড়তে নামছে। শচী সিট-এ উঠে বসতেই ছোকরাটি বলল, কিছুই হবে না দিদি। বিটুবাবুদের পয়সা আছে। ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবে।

শচী বলল, জানি। তবু ছাড়ব না। তোমরাও ছেড়ো না।

আমাদের মধ্যে এককাট্টা ভাবটা নেই তো।

তোমাদের তো ইউনিয়ন আছে।

আছে। কিন্তু বিটুবাবুদের কিছু করতে পারবে না। ইউনিয়নের লীডারর

পিণ্টুবাবুর বন্ধু।

শচী কিছু বলল না। তবে ভাবল। এক জায়গায় একটা পুরোনো পরিবার বহুদিন বসবাস করার ফলে শেকড়বাকড় গেড়ে ফেলেছে। প্রভাব প্রতিপত্তি টাকার জোরও কম নয়। হয়তো কিছুই করা যাবে না এদের। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।

হাসপাতালের সামনে বেশ একটু ভীড়। জনা ত্রিশেক রিক্সাওয়ালা জড়ো হয়েছে। চেঁচামেচি নেই, তবে চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

শচী নামতেই একজন এগিয়ে এল। একটু মস্তানের মতো চেহারা। গায়ে লাল স্যাণ্ডো গেঞ্জী। গলায় কার-এ বাঁধা একটা চৌকো তাবিজ। পরনে ময়লা লুঙ্গি। বয়স বছর ত্রিশেক।

দিদি, আপনি কিন্তু সাক্ষী দেবেন।

শচী অবাক হয়ে বলল, কেন দেবো না?

অনেকেই শেষ অবধি ভয় খেয়ে যায় তো।

আমি কাউকে ভয় পাই না। লোকটা কেমন আছে?

ডাক্তার বাসু দেখছেন। ভালো ডাক্তার। তবে কেউ কিছু বলছে না।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করা যায় না?

লোকটা হাত তুলে দেখাল, ওই দিকে আউটডোরের ঘরআছে। ওখানেই চলে আসবেন। আপনি গিয়ে বসুন।

হাসপাতালের অবস্থা এই প্রথম দেখল শচী। যথেষ্টই খারাপ। তবে তৃতীয় বিশ্বে তো এরকমই হওয়ার কথা।

ডাক্তারের ঘরখানা একেবারেই বে-আব্রু এবং শ্রীহীন। এখানে কোনোও চিকিৎসা বা রোগী-পরীক্ষা হয় বলে মনেই হয় না। শচী একটা শক্ত কেঠো চেয়ারে বসে আঁচল দিয়ে মুখের সামান্য ঘাম মুছল। একটা লড়াইয়ের গন্ধ আছে বলে সে যথেষ্ট চনমনে বোধ করছে। টনটন করছে বিষদাঁত। সে ছোবল তুলেছে। ছোবলটা লক্ষ্যবস্তুতে সে বিঁধিয়ে দেবেই।

শান্তভাবেই অপেক্ষা করতে লাগল শচী। হাতব্যাগ থেকে একখানা বই বের করে পড়তে লাগল। "টেরোরিস্টস অব মারসিন্যারিজ" নামে এক-খানা পেপারব্যাক। সদ্যই কিনেছে। টেররিজম-এর মধ্যে যে পেশাদার ভাড়াটে মনোভাব ঢুকেছে তা-ই প্রতিপাদ্য বিষয়। অশান্ত পৃথিবীর সর্বত্রই চলছে সন্ত্রাস, হত্যা, গণ্ডগোল এবং তার পিছনে মদত দিচ্ছে অন্ধ ব্যবসায়ী, ড্রাগ পাচারকারী, অসাধু ক্ষমতালোভী। শচী সবই প্রায় মোটামুটি জানে।

পড়তে পড়তে ডুবে গিয়েছিল। ডাক্তার বাসু চেয়ারের শব্দ তুলে বসতে শচীর চটকা ভাঙল।

বাসুকে এক নজরে জরিপ করে নিল শচী। বিষণ্ণ চেহারা। তবে সুপুরুষ। আপনিই ডাক্তার বসু ?

বাসু প্রথমে কোনোও জবাব দিলো না। নীরবে একটু চেয়ে রইল শচীর দিকে। তারপর বলল বসু আমার পদবী নয়। আমার নাম বাসুদেব ব্যানার্জি। লোকে ডাক্তার বাসু যে কেন বলে তা আমিও ভেবে পাই না।

শচী একটু লজ্জা পেয়ে বলে, মাফ করবেন।

আরে না, লোকে যা বলে তা বলতে দোষ কী ? তবে আপনি ডাক্তার বাসু বলায় ভুলটা ভেঙে দিলাম। এবার বলুন, কী জানতে চান।

আমি ওই লোকটার খবর নিতে এসেছি। রিক্সাওয়ালা।

মার্জিন্যাল কেস। তবে —

তবে কি ?

ইনজুরি তো ফ্যাটাল নয়। সমস্যা হলো ভাইটালিটি নিয়ে। শরীরে জীবনীশক্তি বলে কিছু নেই।

এটাকে নিশ্চয়ই পুলিশ-কেস হিসেবে নিয়েছেন ?

দুহাতের পেলো ডলে একটা অসহায় ভঙ্গি করে বাসু বলল, আমি তার কী জানি। পুলিশকে খবর দেওয়ার দায়িত্ব আমার নয়, হাসপাতালের। আমি ওর রিক্সায় ছিলাম। আমার চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে।

বাসু আবার তার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মৃদু স্বরে বলল, আপনি কি অ্যাকশন চান?

চাই। বিটু না কী যেন লোকটার নাম, তাকে আমি জেল-এ পাঠাতে চাই। মেডিক্যাল রিপোর্টটা আপনি কিরকম দেবেন তার ওপর সব নির্ভর করবে।

বাসু এবার হাসল। মৃদুস্বরে বলল, রিপোর্ট হবে। তার আগে আমার যা কাজ তা আমাকে করতে হবে। বিটুর জেল হওয়ার চেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট লোকটাকে বাঁচানো। আপনার ব্লাড গ্রুপ কী তা জানা আছে?

ও গ্রুপ।

খুব ভালো। আপনার রিক্সাওয়ালার কিছু রক্ত দরকার। আপাতত আপনি ওর জন্য কিছুটা রক্ত দিতে পারেন।

শচী একটু বিবর্ণ হলো। সে যথেষ্ট সাহসী ও ডাকাবুকো বটে, কিন্তু ছুঁচকে সে ভয় পায়। রক্তের রং দেখলে তার গা শিরশির করে। একটু থেমে ভেবে নিল শচী। তারপর বলল, ঠিক আছে।

বাসু ক্লান্তিতে একটু পিছন দিকে হেলে বসল। চোখ বুজে নিস্পন্দ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর স্তিমিত গলায় বলল, আপনি বোধহয় একটু নার্ভাস টাইপ।

না। আমি রক্ত দিতে পারব।

ইরোইকসের দরকার নেই। ও গ্রুপ খুব কমন গ্রুপ। আপনি না দিলেও ওর বন্ধুরা দেবে। হয়ে যাবে।

শচী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, প্রয়োজন হলে আমিও দিতে পারি।

বাসু তার দিকে চেয়ে বিমর্ষ মিয়োনো গলায় বলল, হাসপাতালের অবস্থা কিরকম তা তো নিশ্চয়ই জানেন?

দেখছি, খুব খারাপ।

হ্যাঁ, ভীষণ খারাপ, চিকিৎসা খারাপ, ওষুধ খারাপ, পরিবেশ খারাপ,

আর তার চেয়েও খারাপ হলো এখানকার খাবার। খুব গরিবেরও খেতে কষ্ট হয়।

তাও জানি।

আপনার রিক্সাওয়ালাটির যখন জ্ঞান ফিরবে এবং নরম্যাল ডায়েট নিতে পারবে তখন তার কিছু পুষ্টিকর খাবার দরকার হবে। পারবেন কিছু কিনে দিতে?

নিশ্চয়ই পারব। কী লাগবে বলুন।

এখন নয়। এখন ওকে ড্রিপ দেওয়া হয়েছে। যদি লোকটা বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারে তাহলে দু তিন দিন পর আপনি আমার কাছ থেকে একটা লিস্ট নিয়ে যাবেন। ভয়াবহ কিছু নয়। দামী কিছুই লাগবে না। কিছু ফল, কয়েকটা ওষুধ, একটু প্রোটিন আর দুধ।

নিশ্চয়ই। আমার নাম শচী চক্রবর্তী। নর্থ বঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। আমার ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে যাবো?

বাসু অবাক হয়ে বলল, ঠিকানা দিয়ে কী করব? আপনি যদি নিজে থেকেই রোগীর খবর নেন তবেই হবে।

ডাক্তার বাসু ছোকরা নয়, তবে বয়স খুব বেশিও নয়। এই বয়সেই মুখে গভীর বিষাদের রেখা কেন তা বুঝতে চেষ্টা করছিল শচী। তারপর সে ডাক্তার বাসুকে যা বলল তা সম্পূর্ণ বাস্তব এক হিসেবী কথা। সে বলল, রিক্সাওয়ালার জন্য আমার যা করা উচিত তা শুনলাম। কিন্তু যে লোকটা ওকে মেরেছে তার কি কিছুই কর্তব্য নেই?

ডাক্তার বাসু তার ম্লান চোখ তুলে তাকাল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আমি যাকে সামনে পাই তাকেই কিছু না কিছু করার কথা বলি। কার কোনটা কর্তব্য তা সবসময়ে মনে থাকে না। বিটুকে দিয়ে যদি করাতে চান তাও পারেন। কেউ একজন করলেই হলো। বোধহয় ওর ফ্যামিলির জন্যও কাউকে কিছু করতে হবে, নইলে তারা মরবে না খেয়ে।

হ্যাঁ, সেটাও বিটুদেরই করা উচিত।

বাসু একটা অসহায় কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কে করাবে?

পুলিশ।

বাসু চুপ করে টেবিলের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আপনি কি সোশ্যাল ওয়ার্কার?

একরকম।

তাহলে হয়তো আপনি পারবেন। কে করবে, কার করা উচিত তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু কাউকে তো করতেই হবে। সেই দায়িত্বটা আপনি নেবেন? নিলে ভালো হয়। আমার মাইনে বা প্র্যাকটিসের রোজগার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, থাকলে—

শচী একটু আগ্রহ বোধ করল বাকিটা শুনতে, কিন্তু কোনোও প্রশ্ন করা অভদ্রতা হবে বলে চুপ করে রইল।

বাসু মাথা নেড়ে বলে, কিছুই থাকে না। মানুষের প্রয়োজন আর চাহিদা এত বিপুল যে, কিছুই করতে পারি না।

শচী একটু নম্র হয়ে বলল, এটা তো একার কাজ নয়। অনেকের কাজ। সরকারের দায়িত্ব। আপনি নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে কত মানুষের উপকার করবেন।

বাসু গভীর হতাশার গলায় বলল, কেউ তো দায়িত্ব নেয় না। কাউকে বলেও কিছু লাভ হয় না। এই হাসপাতালের পিছনে যে বিরাট টাকা খরচ হয় তাই দিয়ে চমৎকার চলতে পারত। ওষুধ, খাবার, যন্ত্রপাতি কিছুই যে কেন পাওয়া যায় না হাসপাতালে! একজন ঝাড়ুদার বা মেথরও ঠিকমতো কাজ করে না।

ডাক্তার বাসুর গভীর হতাশা শচীনকে একটু স্পর্শ করল। লোকটির মধ্যে এখনও দয়ামায়া আছে। এখনও পোড় খায়নি, শক্ত পোক্ত হয়ে ওঠে নি। বেচারা।

শচী বলল, আমার যেটুকু করার করব। তবে আমি অনেক দূরে থাকি। অত দূর থেকে খুব বেশী কিছু করা যাবে না।

আপনি কোথায় থাকেন ?

একবার বোধহয় বলেছি আপনাকে, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির ক্যাম-পাসে। আপনি এত অন্যমনস্ক কেন ? ডাক্তারের অন্যমনস্ক হওয়াটা কিন্তু বিপজ্জনক।

বাসু অবাক হয়ে শচীর দিকে চেয়ে বলল, আমি আর অন্য সব ব্যাপারে অন্যমনস্ক হলেও চিকিৎসার ব্যাপারে নেই। আজ অবধি কেউ এই কথা বলে নি।

যাদের মধ্যে আনমাইণ্ডফুলনেস থাকে তাদের সব ব্যাপারেই সেটা ফুটে ওঠে।

বাসুর ফর্সা রঙে একটু লালচে আভা লাগল। তবে কিছু তেমন বললেন না, শুধু বলল. ও. তা হবে।

শচী উঠল, আজ যাচ্ছি।

১৪

ঝিন্টু তার আদরের সাইকেলটার দুর্দশা দেখছিল, হাঁটু গেড়ে বসে। লাভ স্টোরের সামনে। এই স্পোক এখানে পাওয়া যাবে না। সারাই করে নিতে হবে।

একটু অপরাধী মুখ নিয়ে বিটু দৃশ্যটা দেখছিল। ঝিন্টু তার চমৎকার সাইকেলটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

ঝিন্টু সাইকেলটা একটু তুলে চাকাটা ঘোরাল। না, রিম টাল খায় নি। খেলে ফ্রেমের গায়ে লাগত। স্পোকগুলো মোটামুটি ঠুকে সোজা করে দিয়েছে সারাইকর। আপাতত চালানো যাবে। তবে নিখুঁত জিনিসটার একটা খুঁত হয়ে গেল। ঝিন্টুর চোখ ফেটে জল আসছিল। শরীর রি-রি করছে রাগে। দাদা না হলে হাত চালিয়ে দিত। তবে মনে মনে যে অবিরল গালাগাল দিয়েছিল, শালা ঢ্যামনা, সাইকেল চালাতে জানে না তবু শালা ওস্তাদি দেখাবে। ব্যালান্স নেই, শরীর ঢ্যাপসা, রিফ্লেক্স নেই, দু'নম্বরী একটা দোকানদার, তোর এত আস্পা কিসের? ইঃ, বউয়ের বাচ্চা হয়েছে! উনি একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটলেন সাইকেলটার বারোটা বাজাতে।

সাফাই হিসেবে বিটু অবশ্য ভাইকে অনেক স্তোক দিয়েছে। ঝিন্টু একটাও কথা বলে নি।

বিটু নেমে এল দোকান থেকে।

বুঝলি ঝিন্টু, লোকটাকে খুব মেরেছি। খুব।

ভালো। আমি যাচ্ছি।

তোর সাইকেল আমি কিনে দেবো।

লাগবে না। দেনেওলা বহুৎ দেখেছি।

রাগছিস কেন। সাইকেল আমারও ছিল।

জানি। ব্যালান্স নেই, সাইকেল চালাতে জানো না, তবু চড়তে গেলে কেন?

বিটু একটু গরম হয়ে বলে, দ্যাখ, বড় বড় কথা বলিস না। সাইকেলবাজ আমি তোর চেয়ে কম ছিলাম না।

ছিলে তো ছিলে। তাতে কী? এখন তো বসে বসে আর খেয়ে খেয়ে মোটা হয়েছো। সাইকেলে তোমার চড়াই উচিত নয়।

বিটুর রাগ হঠাৎ ওঠে। তার কারণ বহুবিধ। এক হলো, যে বুড়ো রিক্সা-ওয়ালাকে সে মেরেছে তার অবস্থা ভালো নয় বলে একটা খবর রটেছে। হাঙ্গামা লাগা বিচিত্র নয়। তার ওপর বাচ্চা হওয়া নিয়ে টেনশন, তার ওপর দোকান নিয়ে টেনশন।

বিটু রাগে গড়গড় করে উঠল, মুখ সামলে কথা বলিস কিন্তু ঝিণ্টু, ভালো হবে না।

ঝিণ্টু সেদিনকার ছেলে, এক রত্তি। কিন্তু তেজ তার কিছু কম নয়। মুখটা তুলে বিটুর দিকে চেয়ে সমান দাপটের গলায় বলল, যাও, যাও, বেশি দাদাগিরি ফলাতে এসো না। কাকে ভয় দেখাচ্ছো?

খুব বাড় বেড়েছে তোর! অ্যাঁ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

তোমাকে আমি কিছুই বলিনি, আগ বাড়িয়ে ভালমানুষী দেখাতে এসেছো কেন? জানো, এই সাইকেলটার দাম কত? কিনে দেবে! এঃ বড় কিনে দেনেওলা লোক। ব্রহ্ম গাঙ্গুলীর পয়সায় ফুটানি করে বেড়াচ্ছো আবার কিনে দেবে।

বিটু আচমকাই ভাইয়ের চুলের মুঠির জন্য হাত বাড়াল, ডান হাতে তুলল থাবড়া।

চোখের পলকেই ঝিন্টু সাইকেলটা টেনে আনল দুজনের মাঝখানে।

বিটু কিছু দ্বিধা করেছিল। একটু আগেই এক রিক্সাওয়ালাকে মেরেছে সে। কাজটা ভালো হয় নি।

কী হতো বলা যায় না। কিন্তু কিছু হওয়ার আগেই একটা রিক্সা এসে লাভ স্টোরের সামনে থামল। চটপটে পায়ে একটা মেয়ে নেমে এসে বিটুর দিকে অতিশয় কঠিন চোখে চেয়ে বলল, আপনি বিটু গাঙ্গুলী?

বিটু ঝিন্টুকে মারার জন্য যে হাতখানা তুলেছিল তা নামিয়ে এনে বলল, হ্যাঁ।

আমাকে চিনতে পারছেন?

না তো!

একটু আগে আপনি যে রিক্সাওয়ালার ওপর দারুণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন আমি তার রিক্সায় ছিলাম। আমার নাম শচী চক্রবর্তী।

বিটুর রিফ্লেক্স অনেক কমে গেছে। কেমন ভোঁদামার্কা হয়ে গেছে তার মাথা। কেমন যেন হতচকিত হয়ে বলল. ও।

আপনার নামে আমি পুলিশে একটা রিপোর্ট করেছি। তারা অ্যাকশান নেবে কিনা জানি না। যদি না নেয় তাহলে আমি আপনার বিরুদ্ধে পোলিটিক্যাল অ্যাকশান নেওয়ার চেষ্টা করব।

বিটু মেয়েটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। তার মুখের ওপর এরকম ভাবে কথা বলছে, মেয়েটা কে?

ঝিন্টু সাইকেলে কনুইয়ের ভর রেখে দৃশ্যটা দেখছিল। এটা ঠিকই মেজ-দাকে সে পছন্দ করছে না। রাগ এখনও দাউ-দাউ জ্বলছে ভিতরে। কিন্তু মেজদার অপমানটাও সে তো আর দাঁড়িয়ে দেখতে পারে না।

ঝিন্টু হঠাৎ বলল, শুনুন দিদি, আমি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। তবে আপনার সাবজেক্টে নয়। আপনাকে চিনি। নতুন এসেছেন, এক-সময় পলিটিকস করতেন, সব জানি। কিন্তু এভাবে রাস্তায় ঘাটে চোখ রাঙানোটা ঠিক নয়। আপনি চলে যান।

শচী ঝিণ্টুর দিকে তাকাল। ছেলেটাকে তার চেনা ঠেকল না। বলল, তুমি এর মধ্যে কথা বলছ কেন?

ঝিণ্টু ইংগিতে বিটুকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, আপনার ভিকটিম আমার দাদা, সহোদর ভাই। আমাদের সব ভাইকেই শহরের সবাই চেনে। কেউ কখনও চোখ রাঙায় না।

শচী রাগে জ্বলে যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। তবু গলা ঠাণ্ডা রেখে বলল, কেন রাঙায় না বলো তো? তোমরা কি গুণ্ডা?

গুণ্ডা ফুণ্ডা নই। ভদ্রলোক। আর ভদ্রলোক বলেই রাস্তার লোক আমাদের চোখ রাঙায় না।

শচী তবু মাথা ঠাণ্ডা রাখল, তুমি জানো তোমার দাদা কী করেছে? একটা রোগ-ভোগা রিক্সাওয়ালাকে এমন মেরেছে যে সে এখন কোথায় পড়ে আছে, বাঁচবে কিনা ঠিক নেই!

ঝিণ্টু একটু ভড়কে গেল। গণ্ডগোল একটু হয়েছে সে জানে। সেই গণ্ডগোলে তার আদরের সাইকেলটাও চোট হয়েছে। কিন্তু এতটা সে জানত না।

অবাক হয়ে ঝিণ্টু বলল, কি বলল?

কে বলবে? আমি হাসপাতাল থেকেই আসছি।

শচীর রিক্সাওয়ালা ছোকরা ছেলেটা নেমে দাঁড়িয়ে শুনছিল। হঠাৎ সে বলল, দিদি ঠিকই বলেছেন। লোকটার অবস্থা খারাপ।

ঝিণ্টু বলল, কে দেখছে? ডাক্তার বাসু?

শচী দেবী জবাব দিলো, হ্যাঁ।

ঠিক আছে, খোঁজ নিচ্ছি।

নাও। ভালো করে নাও।

ভাববেন না দিদি, আমরা ভদ্রলোক। রিক্সাওয়ালার তেমন কিছু হলে আমরা দায়িত্ব নেবো।

শচী বিটুর দিকে চেয়ে বলল, সেই কথাটাই বলতে আসা। ডাক্তার

াসু একটা প্রেসক্রিপশন করে দিয়েছেন। কয়েকটা ওষুধ আর ইন-জেকশন, এগুলো হাসপাতালে পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে কিনতে হবে। রিক্সাওয়ালারা চাঁদা তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে বোধহয় হবে না। যদি আপনারা ভদ্রলোকই হবেন তাহলে অন্তত লোকটার চিকিৎসার ভার নিন।

বিটু হাত বাড়িয়েছিল, তার আগেই ঝিন্টু ছোঁ মেরে প্রেসক্রিপশনটা শচীর হাত থেকে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে দিয়ে বলল, ঠিক আছে। আমরা দেখছি।

শচী বিরক্তির গলায় বলল, ডাক্তার বাসু ওষুধগুলোর জন্য অপেক্ষা করছেন। একটু তাড়াতাড়ি দেখলে ভালো হয়।

বিটু মিইয়ে গেছে এটা ঠিক। আজই তার বাচ্চাটা জন্মেছে। এই দিনটায় যত অঘটন না ঘটলেও পারত। মাথাটা তার কেমন যেন নীরেট লাগছিল।

শচীর দিকে চেয়ে বিটু অতিশয় নরম গলায় বলল, দেখুন, আমার একটা ভুল হয়ে গেছে। মানুষ সব সময়ে ইচ্ছে করে সব কাজ করে না। হয়ে যায়।

শচী একটু ভ্রূ কুঁচকে লোকটাকে দেখল। এক সময়ে লোকটা বেশ হ্যাণ্ডসাম ছিল, সন্দেহ নেই। সম্ভবত স্পোর্টসম্যান ছিল। শরীরটা পেটানো, শক্তপোক্ত, শচীর রাগটা এক পর্দা নেমে গেল। তবু যথেষ্ট ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, রিক্সায় আমি বসেছিলাম। ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছি। রিক্সাওয়ালার কোনোও দোষ না। আপনি সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে পারেন নি, অথচ ও বেচারা মার খেয়ে মরল।

সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে পারেন নি কথাটা কানে খট করে লাগল বিটুর। সে অবশ্য রাগল না। বলল, ব্যালান্স তো সব সময়ে রাখা যায় না। যাই হোক, আমার ভাই যা বলেছে তাই হবে। লোকটার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করব।

ঝিণ্টু হঠাৎ গলা বাড়িয়ে বলল, কিন্তু মেজদা, উনি যে পুলিশে রিপোর্ট করেছেন তার কী হবে ?

শচী অবাক হয়ে বলত, পুলিশে রিপোর্ট তো করাই উচিত।

ঝিণ্টু মাথা নেড়ে বলল, পুলিশ যদি অ্যাকশন নেয় তাহলে আমরা লোকটার চিকিৎসা করাবো কেন ? পুলিশকে দিয়েই করান গে।

শচী এই উদ্ধত যুবকটির কথা শুনে বুঝল, ছেলেটা সোজা নয়। বলল, তাহলে কী করবে ?

আমরা চিকিৎসাও করাব আবার জেলও খাটব তা তো হয় না। আপনি থানায় গিয়ে কেসটা উইথড্র করুন, বাদবাকি যা করার আমরা করব।

যদি না করি ?

তাহলে আমাদের দায়িত্ব নেই।

শচী হাত বাড়িয়ে বলল, প্রেসক্রিপশনটা আমাকে ফেরত দাও।

ঝিণ্টু পকেট থেকে সজোরে প্রেসক্রিপশনটা বের করে একরকম ছুঁড়ে দিয়ে বলল, অতই যদি দরদ তাহলে নিজের পকেট থেকে খরচ করুন।

শচী অসহায় রাগে মূক হয়ে গেল।

বিটু মৃদু স্বরে বলল প্রেসক্রিপশনটা আমাকে দিন।

না থাক। যা পারি আমিই করব।

রাস্তায় দু চারজন দাঁড়িয়ে গেছে এবং ভিড় জমে যাওয়ার লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠছে দেখে শচী আত্মসংবরণ করল। আসলে ঠিক এভাবে অ্যাপ্রোচ করাটাও বোধহয় ঠিক হয় নি। রাগ এবং ঝোঁকের বশে সে ওরকম ছুট করে এদের মুখোমুখি হয়েছে।

শচী বিটুর দিকে ফিরে বলল, আপনি কোনোও কথাই বললেন না। আমি আপনার মুখ থেকে জবাবটা শুনতে চেয়েছিলাম, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হবে না।

বিটু কথাটা শুনল, কিন্তু তবু কেমন যেন ভ্যাবলার মতো চেয়ে রইল। তারপর বলল, ভুল হয়ে গেছে। আমার মেজাজটার কিছু ঠিক নেই।

তারপর ঝিন্টুর দিকে চেয়ে বলল, তুই এখান থেকে যা তো। চ্যাটাং চ্যাটাং অনেক কথা বলেছিস। যা।
বিটুর চাপা আক্রোশ তার চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছিল। ঝিন্টু আর কথা বাড়াল না। সাইকেলে উঠে চলে গেল।
শচী এসে রিক্সায় উঠল। ব্যাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে বাস ধরবে।

১৫

বিকেল পাঁচটা নাগাদ গৌরের জীপ গাড়িটা এসে লাভ স্টোরের সামনে থামল। গৌর নেমে এল।

বিটু!

আরে, কাকা! কী খবর, কিছু লাগবে?

গৌর গম্ভীরভাবে বলে, তুই দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যা।

কেন?

বাড়ি গিয়ে বই-টই পড়। আজ দোকানে থেকে কাজ নেই।

কেন বলুন তো! বিকেলেই তো বিক্রিবাটা।

রিক্সা ইউনিয়ন থেকে স্ট্রাইক কল করেছে। মিছিল বেরোবে। সিচুয়েশন খারাপ হতে কতক্ষণ? পুলিশ অ্যাকশন নেবে, খবর পেয়েছি।

বিটুর ফর্সা মুখটা আচমকাই লাল হয়ে উঠল। রাগে, অপমানে গরগর করে উঠে সে বলল, কেন, লোকটা কি মরে গেছে?

মরে যে যায় নি সে তোর কপাল ভালো বলে। ডাক্তার বাসু বুক দিয়ে আগলে না থাকলে এতক্ষণে হয়ে যেত। তা কমও কিছু হয়নি। আমি হাসপাতালে খবর নিয়ে এসেছি। অক্সিজেন স্যালাইন চলছে।

বিটু মাথা নেড়ে বলল, আমি দোকান বন্ধ করব না। যা হয় হোক দোষ যখন করেই ফেলেছি, একটা ফলও পেতে হবে।

অত বীরত্ব ভালো নয়। এটা ট্যাকটিকসের যুগ। ফিলজফির নয়। যা বলছি শোন। বাড়ি যা। না যদি যাস তবে তোর মা বাবা এসে চেঁচামেচি শুরু করবে।

স্ট্রাইক কল হলো, ঝিন্টু জানে না ?

জানে। জেনে কী করবে ?

ঝিন্টুর তো হোল্ড আছে।

ছিল। এখন নেই। পলিটিকসে হোল্ড রাখা অত সোজা নয়! তুই তো আর খবর রাখিস না।

বিট্টু কেমন হাল-ছাড়া গলায় বলল, ঠিক আছে। আপনি যান, আমি দেখছি।

গোঁয়ার্তুমি করিস না কিন্তু। হাঙ্গামা হলে ঠেকানোর কেউ নেই। মিছিল এই রাস্তা দিয়েই যাবে। বাঘা যতীন পার্কে জমায়েত শুরু হয়ে গেছে। যদি চাস তো জীপটা রেখে যেতে পারি। ড্রাইভার তোকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

আমি নিজেই যেতে পারব কাকা, আপনি চলে যান।

আর একটা কথা। পুলিশ তোকে আজ হোক কিংবা কাল হোক, অ্যারেস্ট করবেই। অ্যারেস্ট করতে এলে রেজিস্ট করিস না। পুলিশের কর্তাকে আমার বলা আছে। অ্যান্টিসিপেটরি বেইলও নিয়ে রাখছি।

বিট্টু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে শুনল। জবাব দিলো না।

তুই কিসে যাতায়াত করিস ?

একটা বাঁধা রিক্সা আছে।

সেটা কই ?

সে তো রাত ন'টায় নিতে আসবে।

তাহলে কিসে বাড়ি ফিরবি ?

আর একটা রিক্সা ধরে নেবো।

গৌর বিরক্ত গলয়ে বলে, তোর মাথায় কথাটা ঢুকছে না—না কি ? বললাম না স্ট্রাইক কল হয়েছে। রাস্তা থেকে সব রিক্সা তুলে নিয়েছে। বাস-টাসও বন্ধ হয়ে যাবে এরপর।

তাহলে হেঁটেই চলে যাবো।

ভেবে দেখ। জীপটা রেখে যাবো?

না। তার দরকার নেই।

একা ফিরবি, লোকের মাথা এখন গরম। সামনা সামনি কিছু না করলেও দূর থেকে ইটফিট মেরে দিতে পারে।

এখনও লোকের এত সাহস হয় নি কাকা।

ওই অহংকারেই তুই গেলি। ভাবছিস বিটু মস্তান এখনও মস্তানই আছে। বোকা কোথাকার, তোদের যুগ বহু দিন আগে শেষ হয়ে গেছে। আমি বলি, এই সিচুয়েশনে বীরত্ব দেখানোটা বুদ্ধিমানের কাজও নয়। পাবলিক ক্ষেপলে কোনোও বীরত্বই টেঁকে না।

এই বলে গৌর জীপগাড়িতে গিয়ে উঠল। চলে গেল।

বিটু কিছুক্ষণ চেয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে। দোকানে খদ্দের অনেকক্ষণ আসে নি। রাস্তায় বাস্তবিকই কোনোও রিক্সা দেখা যাচ্ছে না। আবহাওয়াটা কি একটু থমথমে?

বিটু লাভ স্টোরের সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল। দোকানে নিজের প্রিয় জায়গাটিতে বসে ভাবতে লাগল।

কেন মারলাম লোকটাকে? কোনোও ভাইট্যাল কারণও তো ছিল না। লোকটার বয়স বেশী, রোগা, গাঁইয়া, মারার তো কারণও নেই। আজ সে প্রথম বাবা হলো, আর আজই এই ঘটনা? বাচ্চাটা কি তাহলে অপয়া?

কর্মচারীরা একটু গা-ছাড়া ভাবে বসে আছে। সুখময় আর প্রবীর দুজনেই নিরীহ প্রকৃতির, ভীতুও।

বিটু দুজনকে ডেকে বলল, প্রবীর, সুখময়, তোরা বাড়ি চলে যা। এবেলা আর আসতে হবে না।

প্রবীর অবাক হয়ে বলে, কেন দাদা?

দোকান বন্ধ করে দেবো।

এখনই?

না, একটু বাদে। কিন্তু তোদের থাকার দরকার নেই।

হাঙ্গামা হবে নাকি ?

হতে পারে।

তাহলে আপনিই বা থাকবেন কেন ?

আমার একটু খুচরো কাজ আছে। হিসেব মিলিয়ে যাবো। তোরা যা।

একটু দোনোমোনো করল দুজন। তারপর সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল।

বিটু একা। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে বাইরের লোক চলাচল দেখল বিটু। তারপর উঠে রোলিং শাটারটা টেনে নামিয়ে দিলো। দোকান থেকে বেরোনোর ওই একটাই পথ।

ভিতরটা সঙ্গে সঙ্গে ভেপসে উঠল। সামান্য ভেন্টিলেশন দিয়ে তেমন বায়ু চলাচল নেই। পাখাটা খুলে বিটু তার হিসেবের খাতা নিয়ে বসল। সে একজন সফল দোকানদার, তার বেশী কিছু নয়। শুধু কেনা-বেচা। এইভাবেই একদিন জীবন শেষ হয়ে যাবে।

বছর তিনেক আগে একবার বন্ধুদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী গিয়েছিল বিটু। তারপর আর বাইরে কোথাও বেড়াতে যায় নি। কেদার-বদ্রীর স্মৃতি তিন বছরেই ঝাপসা হয়ে এসেছে। এক বদ্ধ জলাশয়ে, নিত্যকার চেনা মানুষ-জনের মধ্যে একই প্যাটার্নের জীবন যাপন করতে করতে মানুষের কি পচন ধরে ? তার মধ্যে নানা উন্মার্গগামিতা মাথা চাড়া দেয় ?

দেয়, নইলে সে কেন এতটা অস্বাভাবিক ?

আর এক মস্ত যন্ত্রণা হলো সোমা। যাকে সে ভালবাসে না, যার প্রতি তার কোনোও আসক্তি নেই, তার সঙ্গে দিনের পর দিন এক ঘরে রাত কাটানো যে কী শক্ত! অথচ সোমা মেয়েটা খারাপও নয়। অনাদরে মানুষ হয়েছে বলে ওর প্রতি স্বাভাবিক একটু করুণাও হতে পারত তার। কিন্তু তাও হয়নি। মায়ের মুখ চেয়ে বিয়ে করতে হয়েছিল। ব্যস, ওইটুকুতেই তার কর্তব্য ফুরিয়ে গেছে।

বদ্ধ দোকান ঘরের মধ্যে ফ্যানের হাওয়ায় আবদ্ধ বাতাসই ঘুরে ঘুরে

কার্বন ডাই অক্সাইড ছড়িয়ে দিচ্ছে। হিসেবটা ঠিকমতো করতে পারছে না সে।

বাচ্চাটা চেয়েছিল সোমাই। একদিন কেঁদে কেটে বলেছিল, যদি আমাকে তোমার প্রয়োজন না-ই থাকে তাহলে অন্তত আমাকে একটা অবলম্বন দাও। একটা বাচ্চা হোক, তাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে পারব। নইলে গলায় দড়ি দিতে হবে আমাকে।

সেই সুবাদে এই বাচ্চা। সোমার হার্ট ভালো নয়। বাচ্চা এখনই হোক তা ডাক্তারবাও চাননি। বাসু একবার বলেছিলেন, আগে হার্টটা ঠিক করে আসুন তারপর ওসব হবে।

বাইরে কার গলা না?

বিটু বাতি নিবিয়ে দিলো। তারপর উঠে গিয়ে শ্যাটারে কান পাতল।

মনে হচ্ছে ঝিন্টু আর তার সাঙ্গপাঙ্গোরা।

ঝিন্টু কাকে বলল, দোকান তো বন্ধ দেখছি। কিন্তু তালা তো বাইরে লাগানো নেই!

ভিতরে নেই তো?

মেজদা! এই মেজদা!

বিটু ভাবল, জবাব দেবে না। তারপর সিদ্ধান্ত পাল্টে শ্যাটারটা টেনে খানিক তুলল।

কী রে??

দোকান বন্ধ করেছিস নাকি?

গৌর কাকা তাই তো বলে গেল।

বন্ধ করে ভালো করেছিস। জোর হাঙ্গামা হতে পারে। তোকে বাড়ি নিয়ে যেতে মা পাঠিয়ে দিলো।

বিরক্ত বিটু বলল, আমি নিজেই যাচ্ছি। তোরা আয়।

নিজে পারবি না। বহু লোক জড়ো হয়েছে বাঘা যতীন পার্কে লেক-চার হচ্ছে। বাজার গরম।

শুনেছি। গৌর কাকা বলে গেছে।

দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গেছে মেলা।

তাতে কী?

তোর বাড়ি যাওয়াটা উচিত। মা বাবা ভাবছে

পুলিশ এসেছিল?

এখনও আসে নি। চল, আর দেরি করিস না।

বিটু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। একটু ভাবল। তারপর বলল, চল।

সন্ধ্যাবাতিটাও দেওয়া হলো না।

ওসব পরে ভাবিস।

বিটু দোকানে তালা দিচ্ছিল নিচু হয়ে, এমন সময় একটা মস্ত ইঁট এসে লাগল ঠং করে রোলিং শাটারের গায়ে।

বিটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। কার এত সাহস?

ছায়ামূর্তির মতো সটাসট সরে গেল ঝিন্টু আর তার সাঙ্গপাঙ্গোরা।

আর তখন মাঝারি মাপের একখানা ইঁট উড়ে এসে জমে গেল বিটুর কপালে।

টুঁ শব্দটিও করতে পারল না বিটু। ধড়াস করে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল।

১৬

বহুকাল বাদে গৌর কন্ট্রাক্টর মুখোমুখি হলো সুমনার।

ছেলেরা আজ কেউ বাড়ি নেই। ব্রহ্মকুমার নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। তারপর হাতপাতালে গেছেন আহত রিক্সাওয়ালার বিলিব্যবস্থা দেখতে। সেখান থেকে নিউ মার্কেট যাবেন বিকেলের বাজার করতে। ফিরে এসে মক্কেল নিয়ে রাত দশটা অবধি কাটিয়ে দেবেন কাছারিঘরে।

সুমনা আজ বড্ডই একা।

গৌরের জীপ যখন বাইরে থামল তখন সুমনা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। এই বয়সেও গৌরকে দেখলে বুক কাঁপে। লজ্জায় রাঙা হন।

দরজাটা খুলে দিয়ে বললেন, এসো।

কর্তাটি কই?

বেরিয়েছে।

রিক্সা ছাড়া বেরোলো কি করে?

হেঁটেই।

হাঁটা তো ভালোই। তোমার কর্তা দিনকে দিন তো স্থাবর হয়ে যাচ্ছে। কেবল টাকা রোজগার ছাড়া কোনোও ব্যায়াম নেই। এভাবে চললে তো ব্লাড সুগার বেড়ে যাবে।

সেই চিন্তায় বুঝি ঘুম হচ্ছে না। কী খবর বলো তো! পাশের বাড়ির ছেলেটা এসে বলে গেল, বিটুকে নাকি মারধর করতে পারে!

গৌর গম্ভীর হয়ে বলে, তোমার এ ছেলেটা মানুষ হলো না সুমনা। একটি একগুঁয়ে গাড়ল।

সুমনা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, ছেলেটা কার দেখতে হবে তো?

গৌর নীরবে সুমনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, হঠাৎ বুঝি মনে পড়ল কথাটা?

হঠাৎ পড়বে কেন? সব সময়েই মনে হয়।

তোমার কোনোও পাপবোধ নেই তো?

সুমনা মাথা নাড়লেন, না, নেই। কেন থাকবে বলো। ওদের একজনও যে তোমার সেটাই আমার সান্ত্বনা। নইলে তোমার ওপর খুব অবিচার করা হতো। সে কথা যাক, কী করবে এখন বলো তো?

গাড়লটাকে তো বললাম, দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে আসতে, এখনো আসে নি?

না।

থানা পুলিশ নিয়ে ভয় নেই। ম্যানেজ করা যাবে। কয়েকটা দিন ওকে কোথাও পাঠানো যায় না?

যাবে কি?

তোমার কথা নাকি খুব শোনে?

শোনে। আবার শোনেও না। অত বড় ছেলেকে কি আর ইচ্ছামতো চালানো যায়। তুমি ভিতরে এসে বোসো। চা করে দিই।

বসব? এখন কি আর বসবার সময় আছে?

একটু বোসো। ফাঁকা বাড়িটায় কেমন ভার লাগছে বুকটা। আচ্ছা বিটুর কি খুব বিপদ?

আরে না। তোমার ছেলেরা কিছু কম গুণ্ডা নয়। পিন্টু, বিটু, ঝিন্টু এরা কি কিছু কম হাঙ্গামা করেছে?

ভয় তো সেখানেই। বিশেষ করে বিটু। বিয়ের পর এখন একেবারে অন্য-

রকম হয়ে গেছে বটে, কিন্তু আগে ওকে নিয়েই ছিল আমার সবচেয়ে বেশী ভয়।

গৌর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বিটুই ছিল তোমার ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে ব্রাইট।

সুমনা আবার লাল হলেন। মেয়েদের কতই গোপন কথা থাকে। দুনিয়া জানতে পারে না, কিন্তু তলায় তলায় কত বাঁধ ভাঙে, ভূমিক্ষয় হয়, ঝড় বাদলায় মাতাল হয়ে যায় অভ্যন্তর। ও কি পাপ হয়েছিল তাঁর? গৌরকে আর তো কিছুই দেওয়া যায় নি। ওই একটি সন্তান শুধু। এমন কি পাপ হয়েছিল?

পাপ পুণ্য কর্মফলের হিসেব করে কি শেষ করা যায়? ও হতেই থাকে, হয়েই যেতে থাকে। কে যে পাপ পুণ্যের বিচার করে কে জানে?

সুমনা মাথা নীচু করে ছিলেন। খুব ধীরে মাথাটা তুলে বললেন, কী হলো বলো তো? এই ব্রাইট ছিল, কেন অমনধারা হয়ে গেল?

গৌর খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, তেমন খারাপও তো কিছু হয়নি। বলতে পারো, সিনেমার নায়ক বা অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ন হয়নি। তা না-ই হলো, মদ মেয়েমানুষের দোষও ডেভেলপ করে নি। তাছাড়া মন্দ গুণ, মাতৃভক্ত। মায়ের উপর টান থাকলে সব কাটিয়ে উঠবে।

সুমনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজ নাতি হলো আমার। তোমারও। কত আনন্দের দিন। আর কী সব হচ্ছে দ্যাখো, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো। বোসো তো, চা করে আনি।

তোমার কাজের লোকটা কোথায়?

নার্সিং হোমে গেছে বউমার খাবার নিয়ে। খেতে তো আর পারবে না অজ। তবু পাঠিয়ে দিলাম।

গৌর বসল।

সুমনা রান্না ঘরে গিয়ে সযত্নে চা করলেন দু কাপ। প্লেটে বিস্কুট আর চানাচুর সাজিয়ে নিয়ে এলেন ট্রেতে করে। গৌর খুব চানাচুর, ঝালমুড়ি

তেলেভাজা ভালবাসে। ওইসব করেই পেটে আলসার বাঁধিয়ে বসেছিল।

খাও।

গৌর কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল। তেমনি আনমনেই চা খেলো।

কী ভাবছো বলো তো!

কত কী! তোমার কথা, আমার কথা, আমাদের কথা। তোমরা ছাড়া আমার আপনজন আর কে আছে বলো সুমনা।

আপনজনের কথা আর বোলো না। পুরুষেরা থোড়াই আপনজনদের তোয়াক্কা করে। কর্তাটাকে তো দেখছি, আমরা থেকেও নেই।

১৭

বিট্টুকে ইটটা যে নির্ভুল লক্ষ্যে ছুঁড়ে মেরেছিল সে কোনোও রিক্সাওয়ালা নয়। ঝিণ্টু তাকে ভালোই চেনে। পালপাড়ার লাট্টু। নয়া মস্তান। মেঘদূত সিনেমা হল-এ যারা টিকিট ব্ল্যাক করে তাদের সর্দার। হংকং মার্কেটে দুটো স্টল দিয়েছে। বিরাজবাবুর কাছ থেকেই যখন দোকানটা নেয় বিট্টু তখন লাট্টুও চেষ্টা করেছিল। তখন থেকেই বিট্টুর সঙ্গে খটা-খটি। মিনি বাস-এর জন্য ব্যাঙ্কের লোন পেতে অনেক ঘোরাঘুরি করে-ছিল। ঝিণ্টুর জন্য লোনটা হয় নি। সেই রাগও আছে।

ঝিণ্টু গোটা যাটেক লোককে চক্রাকারে এগিয়ে আসতে দেখতে পেয়েই ঝাঁপ খেয়ে সরে যায়। সে বুঝতে পেরেছিল ওরা মারলে বিট্টুকেই মারবে।

ইট খেয়ে বিট্টু যখন লাট হয়ে পড়ল তখন ঝিণ্টু আর তার দুই বন্ধু কী করবে ঠিক করতে পারছিল না। লাট্টু পালায় নি। সজ্ঞানেই এগিয়ে এল পড়ে থাকা বিট্টুর কাছ বরাবর।

লাট্টু ঝিণ্টুর দিকে চেয়ে বলল, ফোট, নইলে কলজে খিঁচে নেবো।

ঝিণ্টু একটু কাঁপা গলায় বলল, ওকে মারছিস কেন?

তাতে তোর বাবার কী? ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

খুন করতে চাস?

চাইলে কী করবি?

লাট্টু, এর ফল ভালো হবে না।

যাঃ যাঃ বে, এই লালু, দে তো শালাকে ভরে।

লালুকেও চেনে ঝিন্টু। মহাবীরস্থানের কাছে বাড়ি। একনম্বর হেক্কোড়। ঠোঁট চোয়াল, হিংস্র।

ঝিন্টু পালাতে পারত। গায়ের জোরে না হোক ছুটে এদের আজও হারিয়ে দিতে পারে সে। কিন্তু সব কিছুরই তো একটা শেষ আছে।

ঝিন্টু কিন্তু ভাবনা চিন্তা না করেই এগিয়ে গেল। তারপর আচমকা লাফিয়ে একটা লাথি কষাল সোজা লালুর বুকে। শব্দটা হলো সাজ্ঘাতিক। মড়াৎ।

ঝিন্টুর পা বিখ্যাত। সাইকেল চড়ে এবং দু পায়ের আরও বহু ব্যায়ামের পর দুখানাতেই সাজ্ঘাতিক জোর।

লালু বুকটা চেপে ধরে একটা কোঁক শব্দ করে মাতালের মতো কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েই পড়ল।

তারপর কী হলো ঝিন্টুর আর মনে নেই। বিস্তর দ্রুত পা হাত ঘুঁষি ইট ইত্যাদির মধ্যে একটা ক্যালোডিওস্কোপ কোনও প্যাটার্নই স্থির নয়।

তবে ঝিন্টুর জ্ঞান রইল না।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন বাসু ডাক্তার তার মুখের দিকে চেয়ে চিন্তিত ভাবে বসে আছেন।

কোথায় লেগেছে ঠিক বুঝতে পারছে না ঝিন্টু। মনে হচ্ছে শরীরের কোনোও অংশই বাকি নেই। মাথা থেকে পা অবধি শরীরটা কোথাও অবশ. কোথাও ফোঁড়ার মতো যন্ত্রণা।

বেশ কয়েক মিনিট লাগল মাথার ধোঁয়াটে ভাবটা কাটতে।

ডাক্তার বাসু বললেন, তোমাদের আজকের দিনটাই খারাপ। না?

কেন? কী হয়েছে?

কত কী তো হলো।

মেজদা! মেজদা কি শেষ?

বাসু মাথা নাড়লেন, না, শেষ কি এত সোজা? একটা মানুষ বড় অল্পে শেষ হয় না। একটু সময় নাও। পুলিশ অপেক্ষা করছে জেরা করার জন্য।

আমার বাবা কোথায়?

তিনিও আছেন।

লালুকে আমি একটা লাথি মেরেছিলাম বাসুদা।

বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর বললেন, মাথা ঠাণ্ডা রাখো। লালুকে তুমি লাথি মেরেছিলে কি না তা তো কেউ জানে না। পুলিশকে তোমার অত কিছু বলার দরকার নেই। শুধু বোলো বিটুকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি মার খেয়েছো।

ঝিন্টু একটু হেসে বলল, আমি উকিলের ছেলে, কী বলতে হবে তা জানি। আউট অফ রেকর্ডস আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, লালুর অবস্থা কী?

পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভেঙেছে। যদি ভাঙা হাড় ফুসফুস ফুটো করে দিয়ে থাকে তবে কেস খুব সিরিয়াস। সাধারণত পাঁজরের হাড় ভিতর দিকেই ভেঙে ঢোকে। কাল সকালের আগে কিছু বোঝা যাবে না।

আর লাট্টু? ওর কিছু হয় নি?

লাট্টু কে?

ওই যে মেজদাকে ইট মেরেছে। লম্বা, ছিপছিপে, হাড়কাঠ চেহারা। মেঘদূতে টিকিট ব্ল্যাক করে, দেখেন নি?

বাসু হাসলেন, না আমি সিনেমা দেখার সময়ও পাই না।

আমার চোট কতখানি বাসুদা?

কয়েকদিন ভুগবে। বিটুকে মারল কেন জানো?

না বাসুদা, আজকাল কে যে কাকে কেন মারে তার কোনো ঠিক নেই। লাট্টুর খাড় ছিল। অনেক কারণ।

যাকগে। তুমি পাঁচ মিনিট শুয়ে চোখ বুজে মনটাকে ঠিক করে নাও। পুলিশ আসছে।

আমি কি আণ্ডার অ্যারেস্ট?

না, এখনো নও।

বাসু চলে গেলেন, পুলিশ এল। ঝিণ্টু পুলিশ ইনস্পেক্টরকে ভালোই চেনে। তাদের বাড়িতেও গিয়েছে কয়েকবার।

এই যে ঝিণ্টুবাবু কী খবর ?

ভালো।

প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে ?

পারব।

গণ্ডগোলটা লাগল কী করে ?

গণ্ডগোল লাগেনি। লাট্টু হঠাৎ মেজদাকে ইট মারল। মেজদা তখন দোকান বন্ধ করছিল। ইন ফ্যাক্ট মেজদাকে দোকান থেকে আমিই টেনে বের করেছিলাম।

লাট্টুর ঠিকানা জানো ?

হাসালেন স্যার, লাট্টুর ঠিকানা সবাই জানে।

ইনস্পেক্টর একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, তা বটে। তবে এখন সেখানে সে নেই। অ্যাবসকণ্ডিং।

হংকং মারকেটে ওর স্টল আছে।

সেখানেও খোঁজা হয়েছে।

তাহলে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই। তোমার দাদা বিট্টুর সঙ্গে ওর কোনো শত্রুতা ছিল ?

লাভ স্টোরের ঘরটা লাট্টু নিতে চেয়েছিল। তখন কিছু হয়ে থাকলে থাকতে পারে।

লাট্টু পলিটিক্স করে কিনা জানো ?

না। তবে গুণ্ডা বদমাশদের পলিটিক্যাল কভার তো একটা থাকবেই। সেটাই হয়েছে মুস্কিল। একজন লিডার অ্যান্টিসিপেটারি বেইল চেয়েছেন ওর জন্য।

তাহলে কেস কেঁচেই গেল।

না না, অত সহজে কাঁচবে না, আমরা তো আছি।

মেজদা কোনো স্টেটমেন্ট দিতে পেরেছে ?

না। জ্ঞান এখনো ফেরে নি।

ওকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন। আর সেজদা পিন্টু যদি কিছু জানে।

তোমার সামনেই ঘটনাটা ঘটেছে, সুতরাং যা হয়েছে তার একটা ডিটেল স্টেটমেন্ট কাল এসে নেবো। তোমার সঙ্গে বোধহয় তোমার দুই বন্ধুও ছিল, তাই না।

হ্যাঁ। তারা কোথায় তা অবশ্য জানি না। মারপিটের সময় যে কোথায় ছিটকে গিয়েছিল কে জানে। ওদের কোনো খবর জানেন ?

না। ইনজিওরড অবস্থায় তিনজনকে পাওয়া গিয়েছিল। তুমি, বিটু আর লালু।

ঝিন্টু চোখ বুজল ! একটু শঙ্কিত গলায় বলল, আমার সাইকেলটা ছিল ! সেটা আস্ত আছে ?

ইনস্পেক্টর একটু হাসলেন, সাইকেল ঠিক আছে। ভয় নেই।

ইনস্পেক্টরের দিকে চেয়ে ঝিন্টু একটু হাসল। তৃপ্তির হাসি। পৃথিবীতে তার সাইকেলখানার চেয়ে মূল্যবান সামগ্রী আর কীই বা আছে ?

শোনো ঝিন্টু, আমি চাই না তোমার ওপর আর কোনোও হামলা হোক। লালুকে তুমি যে লাথিটা মেরেছো সেটা ফেটাল হতে পারত। এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। যদি লালুর কিছু হয় তবে কেসটা জটিল হয়ে যাবে।

আমি কী করব ? লালুকে না মারলে যে লালুই আমাকে মারত।

সে তো জানি। আমি বলি কি, তুমি তোমার স্টেটমেন্টে লালুকে মারার কথাটা কবুল কোরো না। তোমার বাবা অবশ্য সবই সাজিয়ে দেবেন। তবু বলে গেলাম।

ইনস্পেক্টর চলে যাওয়ার পরই ব্রহ্মকুমার ঘরে ঢুকলেন। চারদিকে চেয়ে হাসপাতালের বিলিব্যবস্থার প্রতি একটু নাসিকাকুঞ্চন করে ছেলের দিকে তাকালেন।

ব্রহ্মকুমারের একটিই সমস্যা। ছেলেদের সঙ্গে তিনি সহজ ভাবে কথা বলতে পারেন না। আসলে সওয়াল জবাব ছাড়া অন্যরকম কথার অভ্যাস-টাই তাঁর চলে গেছে।

কী রে? অ্যাঁ! কী সব হচ্ছে! তোরা সব কী গণ্ডগোল করছিস?

ঝিণ্টু বাবার দিকে চেয়ে রইল করুণভাবে। বলল, বাবা, আমরা কিন্তু কিছু করিনি।

করোনি! অ্যাঁ! করোনি! তাহলে রিক্সাওয়ালাটাকে বিটু মেরেছিল কেন? অ্যাঁ?

তুমি কি ভাবছো সেজদাকে রিক্সাওয়ালারা মেরেছে?

তাই তো শুনছি। লাট্টু, না কী যেন নাম!

সে রিক্সাওয়ালা নয়। ব্ল্যাকার।

ও-ই হলো। এসব ভালো কথা নয়। তোর এখন কেমন লাগছে?

ভালো। আমার কিছু হয় নি।

কিন্তু হতে পারত। সাঙ্ঘাতিক হতে পারত। তোমরা দুই ভাই আজ মারাও যেতে পারতে।

মরিনি তো! বাবা, মা কোথায়? আসে নি?

তাকে খবর দেওয়া হয় নি। প্রেশার বেড়ে যেত শুনলে।

তুমি ভয় পেয়ো না বাবা। আমরা সামলে উঠব।

বিটুটার এখনও জ্ঞান নেই।

ডাক্তার কী বলছে?

বাপু তো বলছে চিন্তা নেই। কিন্তু কত রক্ত গেছে। তার ওপর তুই আবার কাকে লাথি মেরেছিস। পুলিশ কেস।

ও কিছু নয়। সে তো বিকেলে মেরেছি। পুলিশ বলল, ওটা স্টেটমেণ্টে উল্লেখ না করতে।

ব্রহ্মকুমার সামান্য উষ্মার সঙ্গে বললেন, গুণ্ডাদের ক্ষেপিয়ে দিলে তারা কি তোমাদের সহজে ছাড়বে?

তাদের পরিবারে ঝিন্টুই একমাত্র লোক যে ব্রহ্মকুমারের সঙ্গে মোটামুটি জড়তাহীন ভাবে কথা বলতে পারে। ব্রহ্মকুমারের বোধহয় এক কনিষ্ঠ পুত্রটির উপর একটু বিস্ময়কর টান থেকে গেছে। ঝিন্টু তাই ব্রহ্মকুমারের চোখের দিকে চেয়েই বলল, লাট্টু এমন কিছু মস্তান নয় বাবা। ওকে ভয় খাওয়ার কিছু নেই। দেখলে না, মেজদাকে সামনে থেকে অ্যাটাক করার সাহস পর্যন্ত নেই। আগে খাড়া হই সাত দিনের মধ্যে তারপর ওকে শিক্ষা দিয়ে দেবো।

ব্রহ্মকুমার রীতিমত উত্তেজিত হয়ে বললেন, নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়াটা সবচেয়ে বড় অপরাধ। ওসব যারা করে তারা করুক। তোমাদের ও সব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী? লাট্টু একটা অন্যায় করেছে, তার জন্য পুলিশ যা করার করবে।

বাঃ, আর আমরা ছেড়ে দেবে?

তোমরা একদম গণ্ডগোল করবে না, এটা আমার অর্ডার বুঝলে।

ঝিন্টু বাবাকে চেনে। ক্ষেপলে চণ্ডাল, ভালো থাকলে গঙ্গাজল। সে একটু হেসে বলল, ঠিক আছে বাবা। তবে পুলিশ কিছু করবে না। ধরলেও লাট্টুকে ছেড়ে দেবে। তখন কী হবে?

সে তখন দেখা যাবে।

ব্রহ্মকুমার উঠলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, তোমার মা এখনো খবরটা জানেন না। জানলে কী হবে বুঝতে পারছি না।

বিটুর জ্ঞান ফিরেছে অনেকক্ষণ। সে শক্ত মালে তৈরি। বহু জলঝড় তার ওপর দিয়ে গেছে একসময়। ঘায়েল হলেও সে নিস্তেজ হয়ে বা নেতিয়ে পড়ে নি।

অনেকটা রক্ত গেছে। মাথার ক্ষতটাও বেশ গভীর। তবু জ্ঞান ফেরার পর থেকেই সে ছটফট করছে, আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে বাড়ি যেতে দিন।

ডাক্তার বাসু চিন্তিত ভাবে বললেন, বাড়ি যাওয়াটা রিস্কি হবে বিটুবাবু।

অন্তত আজকের রাতটা রেস্ট নিন। হেড ইনজুরিতে অবজারভেশনে রাখাটা ভীষণ জরুরী।

আমার কিছু হয় নি। ছেড়ে দিন।

কতটা রক্ত গেছে জানেন?

আমি প্রতি মাসে একবার ব্লাড ডোনেট করি। শরীরে অনেক ফালতু রক্ত থাকে ডাক্তার বাসু, আমি জানি ইট ফিট আমি অনেক খেয়েছি। ছাত্র আন্দোলন করেছি না! দুবার ছুরি খেতে হয়েছিল।

তাহলে তো আপনার অভিজ্ঞতা অনেক।

হ্যাঁ তাই তো বলছি দুচার লিটার রক্ত চলে গেলেও আমার কিছু হবে না।

ডাক্তার বাসু একটু হাসলেন। বড়লোকদের তেমন কিছু হয় না তা তিনি জানেন। তাদের শরীরে যথেষ্ট বাড়তি রক্ত থাকে। তারা মরে অতি ভোগে, রোগগ্রস্ত হয়ে।

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের তিন তলায় কেবিনে দুটো বিছানাওলা এই ঘরখানাই হাসপাতালের শ্রেষ্ঠ ঘর। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ঘরের অবস্থা এতই খারাপ যে, কোনোওরকম ইনফেকশনই ঠেকানোর উপায় নেই। এই ঘরেই রাখা হয়েছে বিটুকে। পাশের বেড-এ হাতে নল, মুখে নল আর একজন রুগী। অচেতন।

ডাক্তার বাসুকে একজন লোক দরজার কাছ থেকে ডাকল, স্যার।

কী হলো আবার?

ওই পেশেন্টের বউ এসেছে।

বউ? ডাকো।

ডাক্তার বাসু হঠাৎ বিটুকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই পেশেন্টকে চিনতে পারছেন?

না তো! কে?

মনে পড়ছে না। আজ দুপুরে যাকে আপনি মেরেছিলেন সেই রিক্সাওয়ালা। বিটু কেমন ফ্যাকাসে মেরে গেল। তারপর ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে

দেখল। বেড-এর মাথার ওপরকার বাতিটা নেবানো। মুখটা আবছামতো। একটু কাঁপা গলায় বিটু বলল, ও কি বাঁচবে?

বাঁচত না। রিক্সাওয়ালা তো হাসপাতালের মেঝেয় পড়ে থাকত, কেউ অ্যাটেণ্ড করত না ওষুধ পড়ত না, মরে যেত। তবে আমি কেসটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম।

বিটু কাঁপা গলায় বলল, ডাক্তার বাসু, আমি জানি আপনি ভীষণ ভালো লোক।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, এ দেশে কোনোও ভালো লোক নেই। আমিও নই। ভালো থাকার চেষ্টা হয়তো কেউ কেউ করি। কিন্তু যে সিস্টেমের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয় তা আস্তে আস্তে আমাদের খারাপ করতে থাকে।

বিটু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, জানি। সিস্টেমের কথা খুব জানি। বিটু জানবে না তো কে জানবে? বেঙ্গল টিমের স্কোয়াডেও যে শেষ অবধি চান্স পায় নি আর একজন কমজোরি খেলোয়াড় খুঁটির জোরে জায়গা করে নিয়েছিল বলে। কোচিং নিতে ইন্দোনেশিয়া যেতে চেয়েছিল। পারে নি। সে প্রকাশের মতো খেলোয়াড় ছিল কিনা কে জানে, কোচিং নিলে বোঝা যেত। আজকাল ব্যাডমিণ্টন আর টেবিল টেনিস শিলিগুড়ির খেলোয়াড়রা সারা ভারতেই সুযোগ পাচ্ছে। কেউ কেউ খুবই নাম করেছে। তাদের আমলে শিলিগুড়ির এত গুরুত্ব তো ছিল না। সিস্টেমই ডুবিয়েছিল বিটুকে।

বিটু স্বভয়ে লোকটার দিকে চেয়ে ডাক্তারকে বলল, আপনি কি ইচ্ছে করেই আমাকে ওর ঘরে রেখেছেন?

ডাক্তার বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ইচ্ছে করে রেখেছি বললে বাড়াবাড়ি হবে। তা নয়। আসলে এই ঘরখানাই হাসপাতালের সব চেয়ে ভালো ঘর। পেয়িং বেড। একজন রিক্সাওয়ালার এখানে থাকার কথাই নয়। আমি নিজের রিস্ক-এ রেখেছি। আর একটা বেড ছিল,

আপনার সার্জিক্যাল কেস বলে এখানেই রাখতে হলো। পরে দেখলাম ব্যাপারটা বেশ মজার। আক্রান্ত এবং আক্রমণকারী একই ঘরে।

বিটু বালিশে কনুই রেখে উঠে বসল। বলল, ওর জন্য যা খরচ করতে হয়েছে সব আমি দেবো ডাক্তারবাবু।

দেবেন।

শচীচক্রবর্তী নামে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর আজ আমাকে গিয়ে এ ব্যাপারটা নিয়ে ধমক চমক করছিল। অ্যাগ্রাসিভ টাইপের ভদ্রমহিলা।

জানি। উনি আজ এখানেও এসেছিলেন। রিক্সার সওয়ারি ছিলেন তিনিই পুলিশে উনিই রিপোর্ট করে এসেছেন, বললেন।

ডাক্তার বাসু হাসলেন, পুলিশ নিচে অপেক্ষা করছে বিটুবাবু।

অপেক্ষা করছে! কেন, আমাকে অ্যারেস্ট করবে নাকি?

বোধহয়। আর সেই জন্যই আজ রাতে আমি আপনাকে ছাড়তে চাই-ছিলাম না।

বিটু একটু চিন্তিত হয়। তারপর বলল, বাবা কি সব জানে?

আপনার বাবাও নিচে আছেন। আপনি অ্যারেস্ট হলেও জামিন পেয়ে যাবেন। সেটা প্রবলেম নয়। প্রবলেম হলো হ্যারাসমেণ্ট। আপনি পায়ে হেঁটে বেরোলে পুলিশ হয়তো থানায় নিয়ে যাবে। সেটা ভালো হবে না।

কিন্তু এখানে যে আমার ঘুম হবে না।

আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে দেবো। আনফিট অবস্থায় আপনাকে ছাড়লে আমার বদনামও হবে। অবশ্য বণ্ড দিয়ে আপনি যে কোনোও সময়েই চলে যেতে পারেন।

এই সময়ে দরজায় এক শীর্ণকায়া যুবতী এসে দাঁড়াল। কালো চোখ, গলা বসা, পরনে একখানা সস্তা ছাপা শাড়ি। কাঁখে একটা বাচ্চা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই এসেছে।

ডাক্তার তার দিকে চেয়ে বললেন, কাঁদছো কেন? সব ঠিক আছে।

ও কোথায় ডাক্তারবাবু ? একটু দেখা করে যাবো।

দেখা তো হবে না। ওই যে শুয়ে আছে দরজা থেকেই দেখে নাও। কথা তো বলতে পারবে না।

জ্ঞান আছে ?

জ্ঞান ফিরেছে। এখন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

মেয়েটা দোরগোড়ায় বসে পড়ল। বাচ্চাটা ককিয়ে উঠলো। মেয়েটা বলল, খুনই হয়ে গিয়েছিল, সবাই বলছে যে!

না, তেমন কিছু নয়।

তবে অত সব বলল কিসে ?

ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওষুধ দেওয়া হয়েছে শিরা দিয়ে।

বাঁচবে তো ?

না বাঁচলে এসে আঁশবটি দিয়ে আমার গলাটা কেটে দিও।

আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। গলা কাটতে হলে সেই গুণ্ডাটাকে কাটতে হয় যে ওকে এরকম করেছে।

বিটুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল দেখে ডাক্তার একটু হাসলেন। তারপর মেয়েটাকে বললেন, এই যে বাবুকে দেখছো একে কেমন লোক বলে মনে হয় ?

মেয়েটা বিটুর দিকে জল ভরা চোখে তাকালো। আঁচলে চোখটা মুছে নিয়ে বলল, ভদ্দরলোক।

একেও কারা যেন মেরেছে। মাথা ফেটে গেছে।

মেয়েটা কিছু বলল না।

ডাক্তার বাবু মেয়েটার দিকে চেয়ে বললেন, এরকম কত কী হয়ে যায়। বাচ্চাটাকে কিছু খাইয়েছো ?

মেয়েটা মাথা নিচু করে বলল, এটাকে খাওয়াতে পারি। বুকের দুধ খায় তো। কিন্তু অন্যগুলো পেটে কিল মেরে আছে।

তোমার কটা বাচ্চা ?

তিনটে। ওবেলা রান্না হয়নি। লোকটা তো তিন দিন জ্বরে পড়েছিল। আজ জ্বর গায়েই বেরিয়েছিল। এতগুলো লোক উপোস। আমি যে বাড়িতে কাজ করি তারা আগাম টাকা দেবে না।

ডাক্তার বাসু পকেট থেকে টাকা বের করলেন, যা তাঁকে প্রায়ই করতে হয়। গোটা কুড়ি টাকা মেয়েটার হাতে দিয়ে বললেন, দু-চারদিন আমার কাছ থেকে নিয়ে চালিয়ে নিও।

মেয়েটা টাকাটা হাতে ধরে বলল, রিক্সাওয়ালারা চাঁদা তুলে কিছু দিয়েছে ডাক্তারবাবু।

কত দিয়েছে ?

গুনিনি। গোনার মতো মনের অবস্থা ছিল না। পেট কোঁচড়ে বেঁধে রেখেছি। বেশি হবে না। দশ বিশ টাকা।

ঠিক আছে। দুচার দিন চালিয়ে নাও। এখন বাড়ি যাও। রান্নাবান্না করে বাচ্চাদের খাওয়াও গে। তোমার বরের জন্য চিন্তার কিছু নেই। ভালো হয়ে যাবে।

কথা বলবে না ?

আজ নয়। কাল বিকেলে এসো। কথা বলতে পারবে।

বউটা বসে বসে খানিক্ষণ চোখ মুছল। তারপর কাউকে কিছু না বলে যান্ত্রিক ভাবে চলে গেল।

ডাক্তার বাসু বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, আমাকে রাউণ্ডে যেতে হবে। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকুন।

আমার বাবা তো কই দেখা করতে এলেন না ?

আসবেন। ছোটো জনের সঙ্গে এখন হচ্ছে।

ছোটো জন। বিটু অবাক হয়ে বলল, ছোটো জন কে ?

ঝিন্টু। আপনার চেয়ে মার সে বেশিই খেয়েছে। সিরিয়াস নয়, তবে ভুগবে ওই বেশি।

ঝিন্টু মার খেলো কেন ?

আমি তো স্পটে ছিলাম না। কে বলবে কেন আপনারা মার খেলেন। আমি কেন মার খেয়েছি তা আন্দাজ করতে পারি। কোনোও রিক্সাওয়ালার বুকের পাটা হবে না আমাকে ইঁট মারবে।

আপনার কি অনেক শত্রু?

শত্রু? হ্যাঁ অনেক। আমার শত্রুর অভাব নেই। অন্তত বারোজন মাড়োয়ারি আর গুজরাটী আর পানজাবী আমার দোকানটা নিতে চেয়েছে। আপনি কি জানেন ইঁটটা কে মেরেছিল?

লাট্টু না কার নাম যেন শুনেছিলাম।

লাট্টু? বুঝেছি। এর আগেও আমাকে থ্রেট করেছিল। লাট্টুর পিছনে অন্য লোক আছে। কিন্তু ওরা ঝিন্টুকে মারল কেন? ঝিন্টু তো কিছু করে নি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বলল, ঝিন্টু আপনার মারের বদলা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর বিটু খানিক্ষণ বিছানায় শুয়ে রইল চোখ বুজে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। রিক্সাওয়ালার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে। বিটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ নয়। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।

উঠে বসে বিটু অনুভব করল, তার তেমন কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। শরীরটা একটু দুর্বল ঠিকই। তার শরীরের ভিত শক্ত কাঠামোয় তৈরি। এই দুবলতা তার কাছে কিছুই নয়।

বিটু বিছানা ছেড়ে নামল এবং কয়েক পা হেঁটে দেখল। চমৎকার। কোনো জড়তা বোধ করছে না সে, মাথা টলমল করছে না, চোখে ঝাপসা দেখছে না। মাথায় একটা গভীর ব্যথা টনটন করছে। সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয়।

বিটু ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

পুলিশ নিচে অপেক্ষা করছে হয় তো কিন্তু তারা সকলে বিটুকে চেনে না।

তাছাড়া এমন কিছু সতর্কও তারা থাকবে না। কারণ বিটু বড় অপরাধী নয়।

বিটু একতলায় নেমে চারদিকে চেয়ে দেখল। রাত সাড়ে ন'টা। ভীড়-ভাট্টা নেই। দুজন কনস্টেবল সিঁড়ির মুখে বসে আছে।

বিটু তাদের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে এল। তাকে কেউ তেমন গ্রাহ্য করল না।

রাস্তায় নেমে সে দেখল, রিক্সা চলছে। বিকেলে ওরা একটা মিছিল করেছিল ঠিকই। তবে ধর্মঘট হয় নি। সে একটা রিক্সা থামাল। ছেলেটা চেনা, মন্টু।

বাড়িতে পৌঁছে দে।

মন্টু একটু অবাক হয়ে বলল, আরে বিটুদা! আপনার কী হয়েছে?

ইট লেগেছে। সে অনেক কথা। দারুণ খিদে পেয়েছে। চালা।

মন্টু জোরে চালাতে গেল। কিন্তু প্রথম ঝাঁকুনিতেই মাথাটা ঝন করে ওঠায় বিটু ককিয়ে উঠে বলল, একটু আস্তে। ঝাঁকুনি লাগলে ফের হেমারেজ হবে রে।

পিন্টু যখন ফিরল তখন সুমনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ রে, কী সব শুনছি?

কী শুনছো?

বিটু আর পিন্টুর কী হয়েছে?

পিন্টু মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু না। লাট্টু গুণ্ডা নাকি একটু হামলা করেছিল। অল্প চোট লেগেছে।

ওরা কি হাসপাতালে?

হ্যাঁ। কাল পরশুই ছেড়ে দেবে।

তাহলে তো ভালোরকমই চোট লেগেছে। আমাকে সব কথা খুলে বলবি?

বললেই তো কাঁদতে টাঁদতে শুরু করবে।

আমি অত নরম মেয়ে না'কি রে? তোদের মতো চার চারটে গুণ্ডাকে পেটে ধরতে হয়েছে। মারদাঙ্গা কম করেছিস তোরা? এখন বুক শক্ত হয়ে গেছে। বল তো কী হয়েছিল।

লাট্টু ইট মেরেছিল বিট্টুকে।

কেন?

অনেক দিন ধরেই রাগ জমে আছে। পিছনে কিছু টাকাওয়ালা লোক আছে। তারাই কাজটা করিয়েছে।

আর ঝিন্টু?

ওটার তো কাণ্ডজ্ঞান নেই। খালি হাতে লাট্টুর সঙ্গে লড়তে গেছে।

লাট্টু কে?

একটা উঠতি মস্তান।

তার ঘাড়টা তোরা মুচড়ে ভেঙে দিতে পারিস না?

দেবো। গা-ঢাকা দিয়েছে। তুমি ভেবো না মা।

ঘটনাটা তোর গৌর কাকা জানে?

গৌরকা সব জানে। এ শহরে যা যখন হয় গৌরকা তখনই জেনে যায়। তার হাতে তো অনেক লোক।

পিন্টু মাকে একরকম টেনে ঘরে এনে বলল, তুমি আজ খুব রেগে আছো মা।

সুমনা রাগে গমগম করছেন। আর দুচোখ জলে ভরা। সোফায় বসে বললেন, আমার দু দুটো ছেলেকে যে মেরেছে তাকে কি সহজে ছেড়ে দেবো? তুই একটা রিক্সা ডাক, আমি হাসপাতালে যাবো।

ডাকছি। খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও। আজ বহুত পেরাসনি গেছে। বিট্টু সেই রিক্সাওয়ালাকে মেরেছিল বলে দারুণ গণ্ডগোল। শেষে ইউনিয়নের নেতা ফেতাকে ধরে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছি।

সুমনা উঠে ছেলেকে খাবার বেড়ে দিয়ে বললেন, তোরা আর আমাকে

শান্তি দিলি না। আজ আমার একটা নাতি হলো. তা আনন্দ আর করব কখন ? সন্ধেবেলা গিয়ে একটু দেখে আসা উচিত ছিল।

পিণ্টু চটপট খেয়ে উঠে পড়ল।

বেরোবার মুখেই একটা রিক্সা এসে থামল বাড়ির সামনে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বিটু নেমে দাঁড়াল।

মা!

সুমনা ছেলের দিকে চেয়ে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

বিটুই এসে মাকে ধরল, কাঁদছো কেন ? কিছু হয় নি আমার। দেখ না, হাসপাতাল থেকে চলে এলাম।

মাতৃভক্ত বিটুকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে এলেন সুমনা।

১৯

আউটডোরে আজ প্রচণ্ড ভীড়। ডাক্তার বাসুর হিমশিম অবস্থা। এক একদিন রোগ ভোগ দুর্ঘটনা এত বেড়ে যায় যে, দম ফেলার সময় থাকে না।

ডাক্তার বাসু তবু এই পেশাটিকে উপভোগ করেন। কদাচিৎ কোনো রুগী রোগমুক্ত হ'য়ে ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসে। সেরকম ঘটনা ঘটেই না। মানুষ স্বভাবত অকৃতজ্ঞ। মানুষ স্বভাবত বিস্মৃতিপরায়ণ। কিন্তু ডাক্তার—একজন সত্যিকারের ডাক্তার সর্বদাই উপভোগ করতে পারেন নানা বিচিত্র রোগভোগের সঙ্গে তাঁর লড়াই।

ডাক্তার বাসুদেব আজ ক্লান্ত ছিলেন। আজকাল ক্লান্তি ক্রমেই বাড়ছে। মানুষের রোগভোগ নিয়ে তাঁর চিন্তা প্রবল বটে, কিন্তু নিজের শরীরের খবর অনেককাল নেওয়া হয় নি।

হাসপাতালে আর বেড খালি নেই। তবু অন্তত ছ-জন রুগীকে ভর্তি করা একান্ত দরকার। তার মধ্যে দুটো বোধহয় ক্রিমিন্যাল কেস। তবু চেষ্টা করা যেত। কিন্তু জায়গা না থাকলে কী করতে পারেন বাসু? বেড নেই, মেঝেতেও আর জায়গা নেই। অন্তত আরো শ' খানেক বেড যদি পাওয়া যেত। কত লোককে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে রোজ।

ডাক্তারের ক্লান্তি কেন এত গভীর তা মানুষ বুঝতে পারবে না। ডাক্তার বাসু কতকাল যে ভালো করে ঘুমোন নি, কতকাল পুষ্টিকর খাবার খাননি, কোনো আমোদ প্রমোদ করেন নি, একটাও সিনেমা দেখেন নি, গান শোনেন নি। শুধু রোগ আর রোগ তাঁকে ঘিরে আছে চব্বিশ ঘণ্টা। মাঝরাতে টেলিফোন পেয়ে চলে আসতে হয় বিছানা ছেড়ে। হাসপাতালে নার্সিং হোম-এ। বিয়ে করেন নি বলে বাঁচোয়া, নইলে বোধহয় বউ ডিভোর্স করত।

আউটডোরের সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও আজ বাসু রুগী দেখে গেলেন আরও ঘণ্টাখানেক। এরপর হাসপাতালে দুটি এবং নার্সিং হোম-এ একটি জরুরী অপারেশন। দুপুরে আজ খাওয়া জুটবে না হয়তো। ব্রেকফাস্ট বলতে দুটো টোস্ট আর সঙ্গে কালো কফি। পেটের মধ্যে একটা অস্বস্তি হচ্ছে কখন থেকে। তবু এই খিদের কষ্টটা সহ্য করতে হবে। খালি পেটে ডাক্তার বাসুদেব অপারেশন ভালো করেন।

শেষে রুগীকে বিদেয় করে উঠতে যাবেন, হঠাৎ দেখলেন, লম্বা বেঞ্চ-এর একটি প্রান্তে সপ্রতিভ সুন্দরী এক তরুণীকে।

চিনতে পেরে একটু হাসলেন বাসু। আরে! আপনি কখন?

ঘণ্টা দেড়েক ধরে বসে আছি, যদি আপনার চোখে পড়ে।

বাসু লজ্জিত ভাবে বললেন, বড্ড ভীড় ছিল আজ। একটু যদি আওয়াজ দিতেন!

শচী উঠে এসে মুখোমুখি বসে বলল, ডিস্টার্ব করা উচিত নয় বলে করিনি। একজন ব্যস্ত ডাক্তারকে অন্যমনস্ক করে দিলে রুগীর বিপদ।

আমার দরকারটা তেমন জরুরীও নয়।

বলুন কী করতে পারি।

আমি সেই রিক্সাওয়ালাটার জন্য কিছু ফলটল এনেছিলাম। পাঠিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে দু একটা ওষুধ।

ভালো করেছেন।

কাল বিটু আর ঝিণ্টুদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। পুলিশে খবর দিয়েছি বলে ওরা খুব অসন্তুষ্ট।

বাসু হাসলেন, জানি।

আমার কি আর কিছু করার আছে?

২

দিন সাতেক বাদে এক সন্ধেবেলা ব্রহ্মকুমার তাঁর অফিসঘরে মক্কেলদের সঙ্গে মোকদ্দমা নিয়ে তুমুল আলোচনায় ব্যস্ত, সুমনা রান্নাঘরে তাঁর নিজের জায়গায় স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিতা। কোণের একখানা ঘরে মশারির নিচে সোমা কাত হয়ে শুয়ে তার নবজাতকের মুখখানা নিবিড় চোখে দেখছে আর দেখছে। নিষ্পলক। আশা যেন আর মিটতেই চায় না। মঞ্জরী তার নিজের ঘর গোছাচ্ছিল, সাহায্য করছিল জনার্দন। দিন কয়েক বাপের বাড়িতে যেতে হয়েছিল মায়ের অসুখের খবর পেয়ে। মা এ যাত্রা বাঁচল, ঘরদোর সৃষ্টিছাড়া নোংরা হয়ে রয়েছে কয়দিনে। মণ্টু, বিটু, পিণ্টু, ঝিণ্টু কেউ বাড়িতে নেই। এসময়ে থাকেও না।

ব্রহ্মকুমার এক মক্কেলকে খুব ধমকাচ্ছিলেন। সে এক ঝুড়ি কচু নিয়ে এসেছে উকিলবাবুর জন্য। নিতান্ত গেঁয়ো লোক। যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে। কিন্তু কচু দেখে মেজাজটা ব্রহ্মকুমারের বিগড়েছে। তিনি কচু দু চোখে দেখতে পারেন না। ছেলেরাও পছন্দ করে না। কে খাবে?

ব্রহ্মকুমার বলছিলেন, এ কি কচু খাওয়ার সিজন হে ? ও সব তুমি নিয়ে যাও। আমাদের হেঁসেলে ওসবের বিশেষ চলন নেই।

বলতে বলতে ব্রহ্মকুমারের হঠাৎ মনে হলো, শরীরের মধ্যে একটা কী যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন একটু বে-এক্তেয়ার লাগছে মাথাটা। উনষাট বছর বয়সের কথা খেয়াল থাকে না সবসময়। এখন হঠাৎ খেয়াল হলো।

উকিলবাবু! আপনার কি শরীর খারাপ ?

ব্রহ্মকুমার কথাটার জবাব দিলেন না। মাথাটা চড়াত করে একটা পাক খেল। টেবিলটা দুহাতে ধরে সামাল দিলেন। তারপর তাঁর মনে হলো, দুনিয়ার খেলা তাঁর দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। শরীরে একটা ঘাম দিচ্ছে। মাথাটা খুব দ্রুত আর একটা চক্কর দিতেই চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। মাথাটা আবার পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু ব্রহ্মকুমার আর দেরি করলেন না। উঠে দাঁড়ালেন।

দুজন মক্কেল এসে তাড়াতাড়ি ধরল দুদিক দিয়ে, চলুন নিয়ে যাচ্ছি।

ব্রহ্মকুমার ভিতর বাড়িতে আসতেই প্রথম চেঁচাল জনার্দন, বাবা-মশাইয়ের কী হয়েছে ?

তারপর দৌড়ে এলেন সুমনা।

ব্রহ্মকুমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে কলকল করে ঘামছেন। হাঁসফাঁস করছেন। চোখের দৃষ্টি যেন কেমনধারা।

কোনোরকমে বললেন, ছেলেদের খবর পাঠাও। আর বেশীক্ষণ নয়।

সুমনা চোখে আঁচল চাপা দিলেন। মঞ্জরী কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জনার্দন ছুটল দাদাদের খবর দিতে। একজন মক্কেল নিজের গরজেই বলল, আমার মোটর বাইক আছে, বাসু ডাক্তারকে ধরে আনি গিয়ে।

খুব কষ্টে দেয়াল ধরে ধরে উঠে এলো সোমা।

বাবা! আপনার কী হয়েছে ?

যাচ্ছি মা। ভালো থেকো।

সোমা তার নিজের মতো করে শ্বশুরকে ভালবাসে। সে উবু হয়ে বসে কাঁদতে লাগল।

ব্রহ্মকুমার আর একটা চক্করে পড়লেন। চোখে ধাঁধা দেখছেন। মাকড়সার জাল যেন আবছা করে দিয়েছে দৃষ্টি। ওপরে পাখা ঘুরছে, কিন্তু তিনি বাতাস টের পাচ্ছেন না।

সুমনা মাথায় গলায় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ব্রহ্মকুমার স্ত্রীর দিকে চাইলেন, তোমার জন্য কিছু করতে পারলাম না। যা আছে সব দেখে রেখো।

এরকম করছ কেন? কেন ওসব ভাবছো?

টের পাচ্ছি। মানুষ মৃত্যুকে খুব টের পায়। একটু জল দাও, বড্ড তেষ্টা। অনেকটা জল খেলেন ব্রহ্মকুমার।

মঞ্জরী বেরিয়ে গেল, একে ওকে খবর দিতে। বাচ্চা কাঁদছে বলে সোমাকেও যেতে হলো।

ফাঁকা ঘর পেয়ে ব্রহ্মকুমার বললেন, শোনো সুমনা, আমার কাছে কিছু গোপন নেই। ঝিণ্টু আমার ছেলে নয়, জানি। তবু তাকে কখনো অনাদর করিনি। করেছি বলো? তোমাকেও কখনো···

সুমনার পায়ের নিচে মাটি দুলে উঠল, মাথায় বজ্রপাত ঘটতে লাগল মুহুর্মুহু।

শেষ সময়টায় অসত্যের আড়ালটা সরিয়ে দিলাম। তোমাকে জানানো দরকার যে আমি সব জানি। ক্ষমা করেছি।

সুমনা এমন স্থির ও ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন যে তাঁকে প্রস্তরমূর্তির মতো মনে হচ্ছিল।

ব্রহ্মকুমার চোখ বুজলেন। তলিয়ে যাচ্ছেন, কোথায় যেন এক গভীর গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন, নিরালম্ব বায়ুভূক, মরার পর কি হবে তা বুঝতে পারছেন না। অস্ফুট একটা চিৎকার করলেন, আঃ···

সুমনার চটকা ভাঙল। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, কী হলো? কী হলো তোমার?

চোখ থেকে টপ টপ করে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ল ব্রহ্মকুমারের মুখের ওপর। ব্রহ্মকুমার সাড়া দিলেন না।

সাইকেলের একটা ঘন্টির শব্দ হলো। তারপরই বাড়ি কাঁপিয়ে ঝিণ্টু ঢুকল ঘরে।

বাবা! বাবার কী হয়েছে? এঃ এ তো সিরিয়াস অবস্থা দেখছি!

বলেই ঝিণ্টু আবার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

খবর পেয়ে দ্বিতীয় জন যে এলো সে বিটু! লাভ স্টোর্সে এখন খদ্দেরের দারুণ ভীড়। তার মধ্যেই জনার্দন গিয়ে খবর দিলো বাবামশাইয়ের সাঙ্ঘাতিক অবস্থা।

বিটুর বিশ্বাস ছিল তার বাবা ব্রহ্মকুমারের আয়ু খুব দীর্ঘ, অসুখ বিসুখ কখনোই করে না। সে প্রথমটায় খবরটা বিশ্বাসই করে নি।

কিন্তু ব্রহ্মকুমারের ঘর্মাক্ত মুখ, শ্বাসকষ্ট আর শরীরের পাক খাওয়া দেখে সেও কেমন হয়ে গেল। তার মাথায় এখনো ব্যাণ্ডেজ।

মণ্টুকে খবর দিতে পারে নি জনার্দন। সে একটা এনকোয়ারিতে বাইরে গেছে। পিণ্টুরও কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। বোধহয় সে একটা মোকদ্দমা তার বাবার হয়ে লড়তে জলপাইগুড়ি গেছে।

জনার্দন হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে বলল, গৌর কণ্ট্রাক্টরকে খবর দিয়ে এসেছি. ছুই দাদাকে পেলাম না।

সুমনা বিপন্ন চোখে চেয়ে রইলেন, কী করবেন? তাঁর তো কিছু করার নেই।

মোটর বাইকের শব্দ তুলে মক্কেল ফিরে এলো।

বাসু ডাক্তার কল-এ বেরিয়েছে। অন্য ডাক্তার কাউকে কাছেপিঠে ধরতে পারলাম না। তবে বাসুর বাড়িতে খবর দিয়ে এসেছি। আমি বলি কি, নার্সিং হোম বা হাসপাতালে নিলে ভালো হয়।

সুমনা বিটুর দিকে চেয়ে বললেন, কী করবি ?

বিটু মাথা নাড়ল, দেখছি।

বাসু এলেন বিটু বেরোবার মুখেই, স্কুটারটা ধীরেসুস্থে স্ট্যাণ্ডে খাড়া করে ঢুকলেন ঘরে। মুখটা বরাবরই গম্ভীর আর হাস্যহীন। বাসুর ওপরেই যেন দুনিয়ার সব ভার চেপে আছে। লোকটাকে তেমন পছন্দ করে না বিটু। অনেকেই করে না। কিন্তু ডাক্তার ভালো। দারুণ ভালো। বাসু একটিও কথা না বলে ব্রহ্মকুমারকে পরীক্ষা করতে লাগলো। নাড়ী, বুক, প্রেসার।

আর সেই সময়টুকু সকলের চোখ নিষ্পলক চেয়ে রইল বাসুর দিকে। ডাক্তার বাসুদেব ব্যানার্জি কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন ভগবান। ভাগ্য-নিয়ন্তা। ভাবীকাল।

ব্রহ্মকুমারের সঠিক জ্ঞান ছিল না। মাঝে মাঝে অস্ফুট আওয়াজ করছিলেন। সেই সঙ্গে শরীরটা মোচড় খাচ্ছে মাঝে মাঝে।

বাসু নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে একটা অ্যাম্পুল বের করলেন। ইনজেকশান ভরলেন। তারপর ওষুধটা ঠেলে দিলেন ব্রহ্মকুমারের হাতে।

হাসিমুখে সুমনার দিকে চাইলেন তারপর।

সুমনাও চেয়ে আছেন, কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় হচ্ছে।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, অতটা গম্ভীর হওয়ার কিছু নেই। কিছুই তেমন হয় নি ওঁর। পেটে প্রচুর গ্যাস। তাই থেকে প্রেসার বেড়েছে। রাতটা ঘুমোতে দিন। কাল সকালে আমি আবার আসব।

কোনো ভয় নেই ?

না, তবে ডিমেনশিয়া হতে পারে। হয়তো একটু স্মৃতিভ্রংশ ঘটবে, তবে সাময়িক। ভয় পাবেন না। এসব কেস-এ হয়।

বাসু উঠলেন। ক্লান্ত, ধীর পায়ে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সুমনা ব্রহ্মকুমারের মশারিটা টাঙাতে টাঙাতে বিটুকে বললেন, আর কাউকে ডাকবি ?

বিটু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি চাইলে ডাকতে পারি, কিন্তু বাসুর ওপর ডাক্তার নেই।

জানি। তবু কেমন যেন মনে হয়, শুধু গ্যাস থেকে কি এতটা হবে?

ডাক্তারির আমিও তো কিছু জানি না মা। কী বলব?

সুমনা মশারি গুঁজলেন। বাসু প্রেসক্রিপশন রেখে গেছেন একটা। সেটা বিটুর হাতে দিয়ে বললেন, নিয়ে আয়।

বিটু বেরিয়ে গেল।

সুমনা পায়ে পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। জীপ-এর নির্ভুল শব্দ শুনতে পেলেন। বুকটা থরথর করে কেঁপে উঠল, গৌর আসছে।

জীপটা থামতেই গৌর লাফ দিয়ে নামল।

কী খবর?

ভালো।

জনার্দন যে গিয়ে বলল, শেষ অবস্থা!

না। সিরিয়াস কিছু নয়। বাসু ডাক্তার দেখে গেছে।

বাসু! ওঃ তাহলে চিন্তা নেই।

আমার একটু কথা আছে।

কথা! বলো।

ঘরে এসো। আমার ঘরে।

গৌরকে নিজের ঘরে এনে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলেন সুমনা।

সর্বনাশ হয়েছে।

কী সর্বনাশ হয়েছে সুমনা?

ও তো সব জানে।

কে? ব্রহ্ম?

হ্যাঁ।

গৌর হঠাৎ হেসে উঠল, জানবে না কেন?

তার মানে?

গৌর সুমনার দিকে হাসিমুখেই চেয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, সব কি গোপন করা যায় সুমনা?

তার মানে?

ব্রহ্ম একদিন আমাকে বলেছিল।

কী বলেছিল?

সে অনেক কথা। সব তোমার শুনে কাজ নেই। কিন্তু তোমার বর আমাকে চার্জ করে নি, রাগ দেখায় নি, কিছু না। শুধু সে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে সব জানে বা আন্দাজ করে।

সুমনার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে।

আমার তাহলে কী হবে? কি করে ওর ঘর করব?

যেমন করছো তেমনই করবে। কিছু ইতরবিশেষ হবে না। ব্রহ্মও তো জানে, সে তোমাকে সময় দিতে পারে না, বেচারার প্রেম ভালবাসাটাও আসে না, অ্যান্টিরোমান্টিক লোক। হি ইজ এ ডিফল্টার অ্যাজ এ হাজব্যাণ্ড। সুতরাং তার বউ যদি সামান্য দ্বিচারিণী হয় তো কী করার আছে?

কিন্তু আমি। আমি কি করে ওকে মুখ দেখাবো?

পারবে। জীবন তো একটাই, যা পেয়েছো আঁজলা ভরে তুলে নিয়েছো। পাপ-টাপ বলে কিছু নেই সুমনা।

তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেন এসব কিছুই নয়। এরকম হওয়াই বুঝি স্বাভাবিক। আমি তোমার বউ হলে বলতে পারতে একথা?

গৌর হঠাৎ গম্ভীর হলো। চোখ নামিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল, না সুমনা, তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী হলে হয়তো এরকম উদার হতে পারতাম না। সেদিক দিয়ে ব্রহ্ম অনেক বড় মাপের মানুষ। কিন্তু কেন পারতাম না জানো? তুমি বলেই। আর তোমার সঙ্গে যে পরকীয়া করেছি তারও কারণ হলো, তোমাকে আমার হাফ-বউ বলেই তো ধরতে হয়। একটু সময়ের গণ্ডগোলে পিছলে গেল লগ্নটা, নইলে—

সুমনার চোখে টলমল করছে জল, যদি ঝিন্টু কখনো জানতে পারে?

গৌর উদার গলায় বলল, আজকালকার ছেলে তাদের মানসিকতাই আলাদা। হয়তো স্পোর্টিংলিই নেবে। আমার তো মনে হয়, ঝিন্টু অলরেডি এরকম কিছু আন্দাজও করেছে।

সুমনা চোখ কপালে তুলে বলেন, সে কী! আমি তাহলে মরে যাবো। বুঝলে? মরে যাবো।

গৌর একটু তিক্ত মুখ করে বলে, শোনো সুমনা, গোপন করার লজ্জা আর ভয় বড় মারাত্মক। ওই টেনশন সহ্য করা যায় না, তার চেয়ে জানাজানি হয়ে গেলে খোলসা হওয়া যায়।

ঝিন্টু তোমাকে কী বলেছে?

মাঝে মাঝেই তো বলে, গৌরকা তুমি আমার বাবা হলে বেশ হতো।

তুমি কি কখনো কিছু বলেছো?

না। আমি কি পাগল?

তাহলে?

ঝিন্টুর মুখ সে তো নিজেও দেখতে পায়। ওমুখে কার ছাপ আছে তা কি এতই কঠিন যে ধরা যায় না?

যায়? আমি তো ওর মুখে আমার ছাপ দেখি।

সেও আছে। দুজনেই আছি আমরা ঝিন্টুর ভিতরে।

সুমনা কথা বলতে পারলেন না। মুখ চাপা দিলেন আঁচলে।

গৌর বলল, বয়স হয়ে গেল সুমনা, এসব নিয়ে আর খামোখা মন খারাপ কোরো না। যা ভালো মনে হয়েছিল করেছি। এখন যা হওয়ার হবে। আমরা তো আর বেশীদিন থাকব না।

তুমি বুঝবে না মায়ের কতখানি লজ্জা সন্তানের কাছে।

লজ্জা একটু তো থাকবেই। তোমরা সামাজিক মানুষ। কিন্তু আমার ওসব নেই। আমি বাস করি আদিম পৃথিবীর মানসিকতায়। তখন বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানই ছিল না। সকলেই সকলের ভোগ্য আর ভোগ্যা ছিল।

আমার সমাজ নেই।

অনেকক্ষণ হলো দরজা বন্ধ করে আছেন। আর ভালো দেখায় না।

সুমনা গিয়ে ছিটকিনিতে হাত দিলেন।

তাঁর হাতের ওপর গৌরের হাত এসে পড়ল।

বড্ড গা ঘেঁষে উত্তপ্ত লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

কী হলো? দরজা খুলতে দাও।

দাঁড়াও, শেষ পাপটুকু করে নিই।

এই বলে হঠাৎ সুমনার ওষ্ঠাধরে চুম্বন করে গৌর। দীর্ঘ প্রগাঢ় এক চুম্বন।

সুমনা বাধা দিলেন না। কোনোদিনই দেননি। দুজন পুরুষের মধ্যে তিনি বরাবর দ্বিধাবিভক্ত। কার পাল্লা ভারী বলা মুস্কিল।

গৌর বলল, শোনো সুমনা, মোরো না। তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে একটা কিছু কাণ্ড করার কথা ভাবছো। মোরো না, প্লীজ। তুমি মরলে আমাকেও মরতে হয়। তোমাকে আমি বড্ড বেশী ভালবাসি।

সুমনা একথার জবাব দিলেন না। দরজা খুললেন।

সামনেই মঞ্জরী দাঁড়ানো, মুখটা কেমন যেন।

সুমনা লজ্জা পেলেন না। মাথা উঁচুতে রেখেই জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলবে?

বাবা কি কিছুই খাবেন না?

না।

ড্রিপ দিতে লোক এসেছে। বাসু পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চলো যাচ্ছি।

যখন স্বামীর বিছানার পাশে গিয়ে বসলেন সুমনা তখনও নিজেকে অশুচি লাগল না তাঁর। দুজন লোক স্ট্যাণ্ডে বোতল ঝুলিয়ে ব্রহ্মকুমারের হাতে ছুঁচ ঢুকিয়ে দিলো। ফোঁটা ফোঁটা ড্রিপ চলে যেতে লাগল শরীরে।

সুমনা শুনতে পেলেন, বাইরের ঘরে গৌর উঁচু গলায় কথা বলছে বিটুর সঙ্গে। তারপর জীপগাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ হলো। গাড়িটা বহুদূর চলে গেল।

সুমনা ভাবলেন, মরবো কেন? শেষ পর্যন্ত দেখব। তারপর মরণ তো আছেই, কে খণ্ডাবে?

ট্যাঁ করে কেঁদে উঠল নবজাতক, একটু হাসলেন সুমনা। এই সংসার ছেড়ে কোথায় যাবেন তিনি?

২১

ডাঃ ব্যানার্জি।

বাসু টেবিল থেকে উপরে মুখখানা তুললেন। আউটডোর শেষ করে রাউণ্ড সেরে এসে ফাঁকা ঘরটায় বসেছিলেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলতে পারেন না।

সামনে দাঁড়িয়ে শচী।

আরে আপনি? কী খবর?

আমি আপনার খবর নিতে এসেছি। কেমন আছেন সত্যি করে বলুন তো!

আমি! আমি তো অ্যাবসোলিউটলি ভালো আছি।

শচী মাথা নেড়ে বলল, না, আপনি ভালো নেই।

কে বলল?

আমিই বলছি।

বাসু মাথা নেড়ে বললেন, কিছু নয়। একটু টায়ার্ড এই যা।

আপনি বড্ড খাটেন।

একটু খাটতে তো হয়ই।

কেন ?

এদেশে কিছু লোক ক্রনিক অলস। তাই বাকি কিছু লোককে ডবল খাটতে হয়। উপায় নেই। বসুন।

বসব না। আপনার তো ছুটি হয়ে গেছে, এবার উঠুন।

উঠব ? কোথায় যেতে হবে ?

বাড়ি।

বাসু হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, সেখানেই বা কী আছে। একজন চাকর। ব্যস।

শচী গম্ভীর হয়ে বলল, ডাক্তার ব্যানার্জি, আপনি নিজেকে শেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু সেটা বুঝতে পারছেন না।

খাটলে কি লোকে শেষ হয় ? আমি তো কাজের মধ্যেই বেশ থাকি।

আর কাজ নয়। বিশ্রাম। উঠুন।

দাঁড়ান মিস চক্রবর্তী। এখনো একটা ভিজিট বাকি। ব্রহ্মকুমার গাঙ্গুলী ইজ সিক। আজ সকালে তাকে দেখতে যাওয়ার কথা। আউটডোর থাকায় সকালে হয়ে ওঠেনি।

শচী অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, বিয়ে করলে আপনার বউ নিশ্চয়ই পালিয়ে যেত।

বাসুদেব হাসলেন। শরীরটাকে টেনে দাঁড় করাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। টায়ার্ড। ভীষণ টায়ার্ড।

মিস চক্রবর্তী, কোনো দরকার ছিল কি ?

শচী গম্ভীর মুখে বলল, ছিল। কিন্তু আপনাকে দেখে ভারী মায়া হচ্ছে। যাক, পরে বলা যাবে।

বাসু ঘড়ি দেখে বললেন, হাতে এখনো কিছু সময় আছে। বলুন না।

আপনার রুগী আগে! দেখে আসুন।

এসে তো আর আপনাকে পাব না।

শচী মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মুখ তুলে বলল, সাধারণ

মেয়েদের মতো আমার বিশেষ লজ্জা-টজ্জা নেই। আমি একসময়ে একস্ট্রিমিস্ট ছিলাম, জানেন কি?

জানি।

অ্যাকশনে ছিলাম।

তাও জানি।

আমি একটি ছেলের সঙ্গে ইনভলভড হয়েছিলাম তখন। পুলিশ তাকে গুলি করে মারে। আমার দু'হাতের মধ্যেই সে মারা যায়।

এটা জানতাম না। সরি।

শচী মাথা নেড়ে বলল, আমার সেন্টিমেণ্ট নেই। যা হয়েছে তা হয়েছে। আমি বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে ভালবাসি।

বাসু চুপ করে রইলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, বর্তমান মানেই হচ্ছে অতীতের ক্রম পরিণতি। অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমানকে মানা যায় না। ওটা ক্রনোলজিক্যাল নয়, সায়েন্টিফিক নয়।

স্বীকার করছি। কিন্তু আমার মানসিকতা ওইরকম।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু কথাটা কী?

শচী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, আজ থাক। কথাটা আর একদিন হবে।

বাসুদেব আপত্তি করলেন না। অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে বললেন, কিন্তু বলবেন। ভুলে যাবেন না।

শচী মাথা নেড়ে বলল, ভুলব না।

শচী চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন বাসু। তারপর স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ব্রহ্মকুমার আজ ভালো আছেন। মুখচোখ স্বাভাবিক। রক্ত চাপ নেমে এসেছে। ড্রিপ খুলে নেওয়া হয়েছে।

বাসু সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, খিদে পাচ্ছে তো!

পাচ্ছে।

সব খাবেন। ঝালমশলা কিছু কম। সাতদিন রেস্ট নিন। তারপর পুরো-

পুরি কাজে নেমে পড়বেন।
আমার যে ইম্পর্ট্যান্ট মামলা আছে ডাক্তার।
পিণ্টু তো আছেই। ও দেখবে।
পিণ্টু! বলে চুপ করে রইলেন ব্রহ্মকুমার। তারপর বললেন, বেশ তাই হোক।
বাসুদেব বাড়ি ফেরার পথে টের পেলেন তাঁর মনের মধ্যে একটা গুঞ্জন হচ্ছে। শচী কিছু বলতে চায়। খুব সাধারণ কথা কি? কোনো রোগ? কোনো সমস্যা? কী?
ডাক্তার বাসু বুঝতে পারলেন না।
স্নান করে খেয়ে একটু শুলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতায় আঠা হয়ে লেগে গেল। আজকাল বড্ড ঘুম পায়।
ঘুমিয়ে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন বাসু। শচীর বিয়ে হয়ে গেছে। একটা ফুটফুটে বাচ্চা কোলে নিয়ে তাঁকে দেখাতে এসেছে। সঙ্গে ছোকরা স্বামী, তার বুকে একটা ছ্যাদা। রক্ত পড়ছে। অভ্যাসবশে ডাক্তার বাসু স্বপ্নেও ক্ষতটার দিকে চেয়ে রইলেন। রক্ত দরকার, এর এক্ষুনি রক্ত দরকার।
ধড়মড় করে উঠে বসলেন বাসু। মাথাটা বড্ড ঝিমঝিম করছে। উঠে কিছু না ভেবেচিন্তেই পোশাক পরলেন।
চাকর এসে বলল, বাবু বেরোচ্ছেন?
হ্যাঁ। ফিরতে রাত হবে।
স্কুটারে তেল ভরে নিলেন পেট্রল পাম্প থেকে। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অনেকটা দূর।
শেষ দুপুরে রাস্তায় তেমন ট্র্যাফিক নেই। বাসুদেব বিনা বাধায় চলে এলেন ক্যাম্পাসে। দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করে শচীর কোয়ার্টারের হদিশ পাওয়া গেল। একটা বিল্ডিং-এর দোতলায় দু ঘরের ফ্ল্যাট।
দরজা খোলা। পর্দা ঝুলছে।

আসতে পারি ?

জবাব নেই।

আসতে পারি ?

জবাব নেই।

বাসু পর্দাটা সরালেন। ভিতরে কেউ নেই। ঘর ফাঁকা। বাসু ঢুকলেন। অজস্র বই আর বই। বিছানা, জামাকাপড়, রূপটান কোনোটাই তেমন গুছিয়ে রাখা নয়। তবু মেয়েলী ঘর বোঝা যায়।

বাসু বিছানার ওপরেই বসলেন। একটা হাই উঠল। দুটো, তিনটে।

বাসুর আজকাল এটা হয়। কোথাও বসলেই ঘুম পায়। ভীষণ ঘুম।

বাসু কখন ঘুমিয়ে পড়লেন টেরই পেলেন না।

শচী গিয়েছিল বাগানে। বাসার পিছন দিকে ফাঁকা জমিতে সে বাগান করেছে। এক গোছা গোলাপ হাতে ঘরে ঢুকেই সে থমকাল। বুকটা কি ধিক্ করে উঠল তার ?

তারপর সে একটু হাসল। গোলাপগুলো টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে বাসুর জুতো জোড়া খুলে পা দুটো তুলে দিলো বিছানায়। তারপর মায়াভরে মুখখানার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। আপন মনে বলল, ওর চিকিৎসা কে করে তার ঠিক নেই। উনি আবার পরের চিকিৎসা করবেন।

বাসু গভীরতম ঘুমে তলিয়ে গেছেন। কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত।

শচী গিয়ে দরজাটায় ছিটকিনি তুলে দিলো। তারপর বাসুর দিকে চেয়ে মুখ টিপে একটু হাসল।

বাসুর চেতনা থাকলে হাসিটার গভীর অর্থ অন্যমনস্ক বাসুরও বুঝতে ভুল হতো না।